# রবীন্দ্র-কাব্যালোক

  

অধ্যাপিকা
শ্রীঅমিতা মিত্র, এম. এ.

  

এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ—কলিকাতা



প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজিং ডিরেক্টার,
এ, মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ,
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, কার্ত্তিক ১৩৬৪

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ,
মিহির প্রেস,
৯এ, সরকার বাই লেন,
কলিকাতা-৭

# উৎসর্গ

## স্বর্গত বিনয়কুমার মিত্র

### স্মরণে

যে কয়েকটি দিন তোমায় কাছে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তখন এমন কোন উপচারই আমার ছিল না যা দিয়ে তোমার তৃপ্তি সাধন করতে পেরেছি। সে মর্মান্তিক ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনা প্রতিনিয়তই আমাকে বিদ্ধ করে।

তোমার সব থেকে বড় এবং একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমি উচ্চ শিক্ষা লাভ করি। জীবনে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তোমার সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারি নি। অপূর্ণতার মধ্যেও এটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাই যে, যে পথের নির্দেশ তুমি আমায় দিয়েছিলে সেই পথকেই আমি আমার জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনার পথ বলে গ্রহণ করেছি এবং সেই সাধনপথে যে মণি কুড়িয়ে পেয়েছি তাই দিয়ে অর্ঘ সাজিয়ে তোমায় উৎসর্গ করলাম।

জানি, যে লোকেই থাক, আমার এই উৎসর্গ ব্যর্থ হবে না, গ্রহণ তুমি করবেই।

অমিতা

# নিবেদন

খুব ছোটবেলা থেকেই ভালবেসেছি শান্তিনিকেতনকে আর ভালবেসেছি আমার পরম আরাধ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভালবাসা পরিণতি লাভ করেছে আমার একান্ত সাধনা ও ধ্যানতন্ময়তায়। ছোটবেলায় রুলটানা কাগজে হাতের লেখা শুরু করেছি কবিগুরুর গানের পংক্তি দিয়ে। আজও সেই পংক্তির ওপর কলম বুলিয়ে চলেছি প্রাণের অক্লান্ত অশ্রান্ত বিপুল আনন্দ নিয়ে। গভীর উপলব্ধি নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য সাধনা করবার ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসিকতা মনে মনে পোষণ করে এসেছি চিরদিন, পারি নি, তবুও কবির 'ক্ষ্যাপা'র মত আশাও ছাড়ি নি। তারই নিদর্শন এই কাকলি।

লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এইগুলি একত্র সংকলিত করে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার প্রথম উপদেশ এবং উৎসাহ দেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসাহিত্য-গবেষণার প্রধান অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়। আমার এই লেখাগুলি পড়তে এবং আমাকে যথোচিত উপদেশ দিতে তিনি তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর উৎসাহ না পেলে এ কাজে অগ্রসর হতে আমি সাহস পেতাম না এ কথা আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় ৺সুশীলকুমার দে মহাশয় সমস্ত পাণ্ডুলিপি যথেষ্ট যত্ন সহকারে পড়েছেন এবং খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত আমার সঙ্গে আলোচনা করে তার সংশোধন করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর স্নেহপূর্ণ ও মহার্ঘ সাহায্য এবং উপদেশ আমি নত মস্তকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি।

শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এর লেখার কিছু কিছু পড়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন, আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে তা স্মরণ করি।

গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধগুলি বহুদিন আগে লেখা হয়েছে। নানা কারণে পুস্তকাকারে ছাপানো সম্ভব হয় নি। দীর্ঘদিন পরে অমিয়বাবু ছাপানোর ভার হাতে নিয়ে আমার বহুদিনের আশা সার্থক করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে নিছক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেই এর মূল্য শেষ করে দিতে চাই না।

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয় বইখানি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার স্নেহের দাবী, তাই এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কোন স্থান নেই।

লেখিকা

# সূচীপত্র

# রবীন্দ্রনাথ

১

'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা!
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারিনে সেবা।'

অন্তরের নিবিড়তম, সত্যতম কথাটি এমন সহজ সুরে কে গাইতে পেরেছে? মানুষের ব্যক্ত-অব্যক্ত, জানা-অজানা, বোঝা-না-বোঝা, চেতন-অচেতন সব লোকেরই কথা কবি বুঝেছেন এবং তা ব্যক্ত করেছেন। মানুষের মনের বিচিত্র আনন্দ-বেদনা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, পাওয়া-না-পাওয়ার কথা ফুটে ওঠে তাঁর প্রতিটি ছন্দে। সর্বমানবের মনের মর্মকথার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র-প্রতিভা সূর্যেরই মত বিরাট বিস্ময়কর ব্যাপার। অফুরন্ত বিচিত্র বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল সূর্যরশ্মির যেমন পরিমাপ করা যায় না এবং সমগ্রভাবে তা ধরাও যায় না, রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করাও আমাদের পক্ষে তেমনি অসম্ভব। এত বড় বিরাট প্রতিভার সামনে দাঁড়াবে কে? তাছাড়া আর একটা কথাও অন্তরের মধ্যে বিশেষভাবে নাড়া দেয় যে, যে অতি-মানবীয় প্রতিভা বা ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ অধিকার করেছেন সে প্রতিভা বা ক্ষমতা নাকি তাঁর নয়। এ কথা কবি বহুবার স্বীকার করেছেন যে, কোন এক অদৃষ্ট শক্তি বা প্রেরণা তাঁকে দিয়ে যা করিয়ে নিয়েছেন তিনি তাই করেছেন। কবি বলেছেন—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।

কবি কত কিছু বলেছেন সে তো কবির নিজের কথা নয়, সে তাঁর অন্তর-তমের আদেশ; তাই একে বুঝতে চাওয়া সহজ নয়, এ শুধু নিবিড় উপলব্ধির বিষয়।

তবুও দুর্নিবার আগ্রহ, অসীম সাহস মানুষের জানবার, জানাবার। দুঃসাধ্য সাধন করতে চায় মানুষ, দুর্লঙ্ঘ্যকে লঙ্ঘন করতে সাহসী হয় মানুষ, অপ্রাপ্যকে করায়ত্ত করতে চায়—সে-ও মানুষ। অজানাকে জানতে হবে, অপ্রাপ্যকে পেতে হবে; মানুষকে পেতে হবে অমিত, দিতে হবে অমিত, তাকে হতে হবে অমিত মানব। এই সাধনা সহজ নয়, দুঃখের দুর্গমপথেই এর জয়যাত্রা। মানুষ সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়, তাই সে এই পথই বেছে নিয়েছে।

২

রবীন্দ্র-প্রতিভার কোন একটি দিকের আস্বাদন করতে হলে এই সাধনা ও একান্ত তন্ময়তার প্রয়োজন। একাগ্র ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা, ধ্যান-ধারণায় মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ আর আবিলতামুক্ত হয়। তখন যা অজ্ঞেয় রহস্যময়তায় সমাচ্ছন্ন তাকে জানা যায়, বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এই সাধনার বেদনা যে বহন করতে পারে চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়বস্তুটি তার কাছে এসে আপনি ধরা দেয়। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়, তাকেই সত্যরূপে জানতে পারা যায়।

তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার কোন একটি দিকের সমগ্র পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হলেও এ কাজে কোন কোন দুঃসাহসী অগ্রসর হয়েছেন। তার কারণ ভালবাসার মধ্যে ঐশ্বর্য-ভয়-ভীতি তো কিছু নেই, সেখানে শুধু অনাবিল মাধুর্য আর চির-পরিচয়ের স্বচ্ছ-আনন্দ। এই দাবীতে আমরাও কবিকে দেখব, জানব, বুঝব, নিবিড় করে কাছে পাব।

৩

রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি, রবীন্দ্রনাথ সবদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র বহুমুখী অলোকসামান্য প্রতিভা সর্ব দেশ ও কালের গণ্ডীকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গিয়েছে—সে গৌরব কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বেরও। তাঁর বাণী ছিল বিশ্বজনীন, তাঁর প্রেম ছিল সর্বব্যাপী, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল

সুগভীর। অনন্তকে আস্বাদন করবার জন্য মানুষের যে আর্তি, তাই ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর ভাবধারার মধ্য দিয়ে।

বাংলা দেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় পরম বিস্ময়কর এবং আকস্মিক ব্যাপার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ঠিকই, কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতবর্ষেরই কবি, ভারতীয় ভাবসাধনার আদর্শেই তাঁর কবিমানস অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট।

রবীন্দ্র-সাহিত্য একটি বহু রূপময় বিচিত্র শিল্পসম্ভার; তাতে নব নব রেখা ও বর্ণবিন্যাসের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পরচয়িতা, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক একাধারে সবই, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা শতমুখী। তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করে নূতন রূপসৃষ্টির আনন্দে চিরচঞ্চল ছিলেন। কবি নিত্য নূতন ভাব চিন্তা আবেগ কল্পনা ভাষা ছন্দ অলঙ্কার আবিষ্কার করেছেন এবং তার প্রকাশভঙ্গিমায় কবিমানসের যে একটি অভিনব রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন তা জগতের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু।

রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা যেমন ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সন্ধান পাই, তেমন মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের রসমাধুর্যের আস্বাদ পাই, বাউলদের মনের মানুষের সন্ধান পাই, তেমনি পাই প্রতীচ্য সাহিত্যের তীব্র আবেগ, তার বাধাবন্ধনহীনতা, দেশকালনিরপেক্ষ মানবিকতা। বিশ্ব-প্রাণের বিচিত্র তরঙ্গমালা রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনাকে আলোড়িত করেছে। এই আলোড়নের অভিব্যক্তি ঘটেছে নানা রূপে, রসে, ছন্দে ও মাধুর্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষ কোন দেশের, বিশেষ কোন কালের বা বিশেষ কোন জাতির নির্দিষ্ট কোন ছাপ পড়েনি। সব দেশ কাল জাতি, সববন্ধনমুক্ত সর্বজনীন ভাব, কল্পনা ও আদর্শের উপর তাঁর সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তাঁর কাব্য যুগের হয়েও যুগাতীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনের সাধনার ধন কাব্য তথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, শান্তিময় বিশ্বপ্রেমই মানুষের জীবনের কাম্য বস্তু; বিশ্বজীবন ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ধরা দিয়ে তবে তার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে, আবার ব্যক্তিজীবন বিশ্বজীবনের মধ্যে লীলায়িত হয়ে তবেই তার সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। এমনি করে সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে ও বিশ্বজীবনে একটি চিরন্তন লীলা চলেছে। এই লীলাই সৃষ্টির

আনন্দ ও সৌন্দর্য। এই আনন্দ ও সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করেছেন এবং তাঁর কাব্যে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করেছেন।

৪

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগ, মানবমহিমাবোধ এবং প্রকৃতি ও মানবের মিলনে অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতি।

কবির কাছে প্রকৃতি জড় নয়, প্রাণময়ী। রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা করলে আমরা দেখতে পাই, এই প্রাণময়ী প্রকৃতি তাঁর কাব্যের উৎস, তাঁর আবেগ-সঞ্চারিণী—শুধু তাই নয়, যেন তাঁর অন্তর সত্তার চিরসঙ্গিনী। এই সঙ্গিনীর সঙ্গে কবি নিগূঢ়-আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতির তুচ্ছতম বস্তুটির সঙ্গে পর্যন্ত কবি আদিজন্মের নাড়ীর টান অনুভব করেছেন। তাই তাঁর কাছে—

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এই পৃথিবীর জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, পশু-পক্ষী, সমস্ত রূপ-রস-স্পর্শ কবির চিত্তবীণায় নব নব রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে কবি স্বীয় প্রাণচেতনার স্পন্দন অনুভব করেছেন। তাই তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, আদি প্রাণের যে প্রবল জীবনোচ্ছ্বাস পৃথিবীর প্রত্যেক গাছে, শিকড়ে শিকড়ে, শিরায় শিরায়, তৃণের প্রত্যেকটি রোমে রোমে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই প্রাণধারা প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই সঞ্চারিত এবং কম্পিত হচ্ছে। তাই এত বড় বিপুল পৃথিবীকে আমাদের অনাত্মীয় বা অদ্ভুত বলে মনে হয় না। কবি বলেছেন—

"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটি গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণ-গুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীপর্যায়—এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়েছে সেখানেই ঝঙ্কার উঠছে, সেখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি।

৫

অতুলনীয় মানবমুখিতা কবির কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর কবি। তিনি মানুষকে, ধরণীকে ভালবেসেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যে মানবের অবিনশ্বর অনুভূতির প্রকাশ অতি ব্যাপকভাবেই রয়েছে। কবি বার বার বলেছেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

'আত্ম-পরিচয়'-এ কবি বলেছেন, "প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না।"

অবজ্ঞা করিনি তোমার মাটির দান
আমি যে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারম্বার—

কবি শুধু ঋণস্বীকারই করেননি, তিনি মানুষকে চরম শ্রদ্ধাও দেখিয়েছেন—

তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ
তারে দিতে হবে চরম সম্মান তব
শেষ নমস্কারে।

মানুষকে কবি কোনদিনই ছোট পরিধির মধ্যে ছোট করে ভাবতে পারেননি। মহামানবের আবির্ভাব তিনি ক্ষণে ক্ষণে দেখেছেন। মানুষের ক্ষণিক অংশের মধ্যে চিরন্তনের অভিব্যক্তি তাঁকে বারে বারেই বিস্মিত পুলকে অভিভূত করেছে। মানুষের স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি প্রভৃতি সুকোমল চিত্তবৃত্তির ভিতর দিয়ে তিনি চির রসময়ের রসের পরিচয় পেয়েছেন। তাই রবীন্দ্র-কাব্য মানুষের জয়গানে মুখরিত। সে মানুষ ব্যক্তিগত পরিধি, দেশ কাল অতিক্রম করে মহামানবে পর্যবসিত। উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ মানুষকে অনন্তের সন্তান রূপেই দেখেছেন, তাই তিনি উপনিষদের বাণীতে বলেছেন, মানুষ মানুষ নয়, মানুষ ব্রহ্ম।

৬

কবির ভগবৎ-উপলব্ধিও মানববিমুখতা নয়। সংসারের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর স্পর্শ লাভ করতে চেয়েছেন। "সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নয়" অথবা "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—এই উক্তির মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায় যে, সংসারকে বাদ দিয়ে কবি সংসারাতীতের সন্ধান

করেননি পরন্তু এই জগতের খণ্ড স্নেহ প্রেম প্রীতির মধ্য দিয়েই তিনি পরম প্রিয়তমের স্পর্শ পেতে চেয়েছেন। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র রূপকে তিনি আনন্দময়ের অমৃত রূপ বলেই অনুভব করেছেন। সর্বত্রই তাঁর লীলাবিলাস বিকম্পিত—এই উপলব্ধিই রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

৭

রবীন্দ্রনাথ সাধক, তবে সে সাধনা বৈরাগ্য-সাধনে নয়, শিল্প-সাধনে, রূপ-সাধনে, ভাব-সাধনে। নানা রূপের ক্ষুধা, রসের ক্ষুধা তাঁর ভাবকল্পনাকে উদ্বোধিত করেছে। বিশ্বের যেখানে যা কিছু আছে—অণু-পরমাণু পর্যন্ত, তাঁর কাছে রূপে রসে সৌন্দর্যে মাধুর্যে প্রতিভাত হয়েছে। সৌন্দর্যানুভূতিকে কবি একটি বিশেষ সত্তা রূপে দেখেছেন। সেই আদি অখণ্ড সত্তা অন্তরে বাহিরে বিরাজিত। বাহিরে যিনি বহুবিচিত্র, অন্তরে তিনি একা, অখণ্ড, স্থির-গম্ভীর। এই সৌন্দর্য-রূপিণী নারীকে তিনি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনার মধ্যেও সেই একই সুর ধ্বনিত, যে সুর নদী-গিরির ওপার থেকে ভেসে আসছে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, বিশ্ব-প্রকৃতিতে, মানবপ্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য উদ্ভাসিত তা সেই চিরসুন্দরেরই অঙ্গদ্যুতি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই আদি রূপের ঝরনাধারায় অভিস্নাত। সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে কবি অলৌকিক ও অখণ্ড সৌন্দর্য দেখেছেন। তাই কবির কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই অসুন্দর নয়। অসুন্দর যদি কিছু থাকে তবে তা সুন্দরের খণ্ডিত প্রকাশ মাত্র। পরিপূর্ণতার কবি সব কিছুকেই সমগ্রভাবে দেখেছেন। তাই কোথাও কিছু অসুন্দর তাঁর চোখে পড়েনি, পড়লেও তার সামঞ্জস্য করিয়ে নিয়ে তবে স্বস্তি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা, কাব্যসাধনার বিরাট সৌধ এই সৌন্দর্যানুভূতির শ্বেত প্রস্তরের উপরেই ভিত্তি স্থাপন করেছে। তাঁর সমস্ত অনুভূতিই সুন্দরের অনুভূতিতে রঞ্জিত।

৮

কবির প্রেমানুভূতির মধ্যেও আছে এই সূক্ষ্ম মহিমাবোধ। তাই তাঁর প্রেমসাধনা একান্ত ভোগবাসনায় পর্যবসিত না হয়ে একটি বিশেষ আনন্দবোধে উপভোগ্য হয়েছে।

সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে যে একটি ভোগতৃষ্ণা জেগে থাকে তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ভোগ সৌন্দর্যলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হতে পারে না যদি না

তার মধ্যে সংযম থাকে। সেই কথাই কবি বলেছেন—"প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়। সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে।···সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে।" তাই আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমসাধনা দেহকে অস্বীকার করেনি, আত্মা যেমন সত্য দেহও তেমনি, দেহ-আত্মার যে প্রেম তাই পূর্ণ প্রেম। ভোগ-বাসনা কবির কাব্যে যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে ভোগ একান্তভাবে দেহের সীমাতেই আবদ্ধ নয়, দেহকে আশ্রয় করে যে প্রেম দেহাতীত এক অপার্থিব সৌন্দর্যলোকে তার নিত্য আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির এই যে বৈশিষ্ট্য, একে তিনি প্রকাশ করেছেন এইভাবে—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।'

৯

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার রহস্যও এইরকম একটি ভাবানুভূতি বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর অধ্যাত্মবোধের মূলেও আছে এই ভাবানুভূতি। যে অদ্বিতীয় অর্ধপরিচিত দেবতার স্পর্শ তিনি বারংবার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছেন, যার নিত্যনূতন লীলায় তাঁর কাব্যজীবন নব নব আনন্দরসে সিঞ্চিত পুষ্পিত হয়ে উঠেছে, সেই চিরবাঞ্ছিত হৃদয়দেবতাকেও তিনি লাভ করেছেন তাঁর নিবিড় অনুভূতির মধ্যে নানা রূপে। কখনো সখা রূপে, কখনো দেবতা রূপে, কখনো মানসসুন্দরী রূপে অদৃশ্য এই সত্তার স্পর্শ তিনি জীবনের উষালোক থেকেই পেয়ে এসেছেন। এই প্রণয়িনীর স্পর্শে কবি কখনো বেদনায় ব্যাকুল হয়েছেন, কখনো আনন্দে অধীর হয়েছেন। কখনো মিলনে, কখনো বিরহে এই মধুর স্পর্শটি ক্রমশই রসনিবিড় হয়ে উঠেছে। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে জীবনের সকল অবস্থায় কবি এই জীবন-দেবতার স্পর্শ লাভ করেছেন। নিদারুণ দুঃখেও তিনি দুঃখরাতের রাজাকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। এইভাবে সীমা-অসীমের, পূর্ণ-অপূর্ণের, খণ্ড-অখণ্ডের নিত্য লীলা-অভিসার চলেছে রবীন্দ্র-কাব্যে।

১০

রবীন্দ্রনাথ সত্য-শিব-সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী। কঠোর দুঃখ, নির্মম কষাঘাতের মধ্য দিয়ে যে শান্তি লাভ করা যায়, সত্য লাভ করা যায় তাই তাঁর কাম্য। তাই অত্যন্ত সহজেই তিনি বলতে পেরেছেন—

মনেরে আজ কহ যে,
ভালমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

সত্যসন্ধ কবি আরও বলেছেন—

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্।

এইজন্যই তাঁর কাব্যে রুদ্র ও শিব সমান পূজা লাভ করেছেন।

১১

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনে মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। মৃত্যুর এত বড় মহিমময় ঐশ্বর্যময় মাধুর্যময় কল্পনা অন্য কোন কবির কাব্যে আছে কিনা জানি না। জীবনের সোনালী উষাতেই কবি অনুরাগকম্পিত কণ্ঠে বলেছেন—

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান

মৃত্যু-বরের জন্য জীবন-বধূ উৎসুক হয়ে সর্বক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অনন্ত-অনাদি প্রবাহবোধ স্বীকার করেছেন। জীবন-মরণ তো শুধু ইহলোকের ব্যাপার নয়, তা লোক-লোকান্তরের একটি সংলগ্ন ঘটনা—এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল। তাই তিনি জীবন ও মরণকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারেননি।

বিশ্ববোধ আর সর্বানুভূতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল সুর। এই বোধের উদ্ভব হয়েছে তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে। এই অধ্যাত্ম-অনুভূতিই সমগ্র রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় যে ভূমার আদর্শ "ঈশাবাস্যং ঈদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—ঈশ্বরের দ্বারা নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত রয়েছে, সেই সর্বব্যাপিত্বের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূল কথা। তিনি রসো বই সঃ—তিনি রসস্বরূপ, আনন্দানুভূতির তিনিই পরম প্রকাশ। আমাদের কবি এই সর্বানুভূতির কথা, এই আনন্দের

কথা অক্লান্ত সুবে নানা ছন্দে রূপে রসে বর্ণে বৈচিত্র্যে প্রকাশ কবেছেন। এই অনুভূতিব প্রেবণাতেই তিনি লিখেছেন—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ সম।

এই প্রেবণাতেই সারা জীবন ধবে তিনি পৃথিবীব নানা পথে প্রান্তবে মরুতে পবতে অনন্ত পথ-পরিক্রমায় চলেছিলেন, তিনি চঞ্চলেব চিবসহচব ছিলেন। তাঁব কাব্যে চিবদিনই এই আকুতি ধ্বনিত হয়েছে—

আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী।

১২

ববীন্দ্রনাথেব সুবিপুল, সর্বতোমুখী প্রতিভা ও বিবাট ব্যক্তিত্বেব সামনে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। কত বিচিত্র দিকে, কত বিচিত্র ভাবে যে তাঁব প্রতিভা বিকাশ লাভ কবেছে, কোন্‌টিকে ছাপিয়ে কোন্ দিকটি যে বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা সমগ্ররূপে ধারণা করাই দুঃসাধ্য। সৃষ্টি, চিন্তা ও কর্মেব সমস্ত দিকে কাবও প্রতিভা এমন অম্লান দীপ্তিতে প্রতিভাত হয়েছে পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত সুদুর্লভ বলা যায়। ববীন্দ্র-জীবন ও কর্মেব সম্যক্ ও সত্য উপলব্ধি আজও স্বদেশে বিদেশে খান দেশেই হয়েছে কিনা সন্দেহ। কবি নিজেই তাঁর 'আত্মপবিচয়'-এ বলেছেন—'নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনেব বিচিত্র অভিজ্ঞতাব ভিতবকার মূল সূত্রটি ধরা পড়তে চায় না।·· নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনাব অভিজ্ঞান আপনাব কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম। তখন একটা কথা বুঝেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমাব আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমাব চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমাব পরিচয়ের সমগ্রতা নই।"

পবিপূর্ণতাব প্রতি মানুষেব একটা স্বাভাবিক টান আছে, তাই আমবা আমাদেব প্রিয়তম কবিকে পবিপূর্ণ রূপেই পেতে চাই। বিশ্বের অমৃত ছবিব পবিপূর্ণ সার্থক প্রকাশ কবি ববীন্দ্রনাথ। তাই তাঁব কাব্যের মধ্য দিয়ে আমবা পবিপূর্ণতাব স্বাদ পাই।

বিশ্বচিত্তেব দূত ববীন্দ্রনাথ, তাঁব শ্রেষ্ঠ পবিচয় তাঁব কাব্যে, তাই তিনি সবাব উপরে কবি, তাহার উপরে নাই।

# মানবসাধক রবীন্দ্রনাথ

## ১

মানবতত্ত্বের যে সাধনা বাংলা তথা ভারতের বৈশিষ্ট্য সে সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্ব-জীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদনের আকুতি [illegible] প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কবি [illegible] দেখিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শৈশবেই তাঁর রচনা শুরু করেছিলেন, কাজেই তাঁর ভিতর প্রচুর দোষ ত্রুটি থাকারই সম্ভাবনা, কিন্তু আশা করেছিলেন সমস্ত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই ঘোষণাটি সত্য যে, "আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে আমি প্রণাম করেছি মহৎকে আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদন। আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে, যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।...আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে। এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।" সত্যিই জীবনের শেষ ক্ষণটি পর্যন্ত তিনি "দুঃসাধ্য চেষ্টা" করে গিয়েছেন তার যথেষ্ট নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তাঁর সবপ্রকার রচনা পরিক্রমণ করলে।

## ২

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি, তার সাধনা মানবরসের সাধনা। কবি তাঁর জীবনের 'প্রভাতসঙ্গীতে' যে সুর ধরেছিলেন জীবনের শেষ অধ্যায়ের 'রোগ-শয্যা'তেও সে সুর কিছুমাত্র ক্ষীণ হয়নি, পরন্তু শেষের কয়েক বছর তিনি এই বিচিত্র সুখ-দুঃখময় মানব-সংসারকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রতিদিনের মানুষ তার প্রতিদিনের দুঃখ বেদনা হাসি কান্না নিয়ে তাঁকে যেন আরও অভিভূত করে ফেলেছিল। এই পৃথিবীর মায়ামোহ, অশ্রুজল, ব্যর্থতাগ্লানি, দৈন্যহতাশা নিরন্তর তাঁকে পীড়া দিত। শাশ্বত মানুষের মধ্যে

শাশ্বত বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় অস্তিত্ব তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেবতা ও মানুষের সিংহাসন পাশাপাশি স্থাপন করতে তাঁর বাধেনি।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্যন্ত কবির কাব্যে বা নাটকে একটা বিষাদ-বেদনার সুর সর্বদাই বেজেছে। কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীতে'—

কী জানি কাহারে আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

কবি বলেছেন, "এই [illegible] পড়ল, সূর্যের আলোতে জগৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এর আবরণ [illegible] দিয়ে, সমস্ত মানুষের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ [illegible] অর্থ [illegible] নয়। এই মহাসমুদ্রের এখন নাম দিচ্ছি মহানন্দ।'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' [illegible] তিনি [illegible], এই বিশ্ব-সংসারকে অন্তরের ভিতর দিয়ে [illegible] উপভোগ [illegible] পাই [illegible] অনন্তকে উপলব্ধি [illegible]। পরিবার [illegible] বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা [illegible], সংসারে [illegible]। আমরা যাকে প্রত্যক্ষভাবে পাই [illegible] তাই আমাদের [illegible] তাই আমাদের [illegible]। তাই 'মালিনী' নাট্যে দেখি—

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে, সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে।

এই মহাবন্ধনকে কবি মায়া মোহ বলে উপেক্ষা করতে পারেননি। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে, এই উপলব্ধি তাঁর আজন্ম সংস্কারের মধ্যে ছিল। সর্বসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ গভীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে একমাত্র প্রিয়জনের ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমরা বন্ধসাযুজ্য লাভ করতে পারি। কারণ একমাত্র প্রেমই আমাদের স্বার্থের সীমানাকে বড় করে দিতে পারে। প্রিয়জনের মধ্যে আমরা আপন আত্মাকেই প্রতিষ্ঠিত দেখি, এবং তার তৃপ্তি সাধন করে পরমানন্দরূপ অমৃত লাভ করে থাকি—যদি অবশ্য সেই

প্রেম স্বার্থবন্ধনহীন সত্যকার প্রেম হয়। এবং একেই তিনি মুক্তিসাধনার পথ বলেছেন। সীমার মাঝে অনন্তের বাঁশী নিরন্তর বেজেই চলেছে এবং তিনি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে, জীবনের নানা পিচ্ছিল পথ দিয়ে, আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিযে আমাদের তাঁর দিকেই আকর্ষণ করছেন, এই বিচিত্র পথেই কত বিচিত্ররূপে তিনি দেখা দিচ্ছেন। উপনিষদ এবং বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের এই আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ আনুগত্য জানিযেছেন।

৩

মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি দুই-ই কবিকে আকর্ষণ করেছে, মুগ্ধ করেছে। কবি তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ বলেছেন, "প্রকৃতি তাহার রূপ রস গন্ধ বর্ণ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন, তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে।···জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিযা ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন। আর কাহারো টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিযাই সেই ভূমানন্দের পরিচয পাওযা, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মোহে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" রবীন্দ্রনাথ এ কথা বহুরূপে বহুবার বলেছেন—"I am sure it was this idea of the divine Humanity unconsciously working in my mind, which compelled me to come out of the seclusion of my literary career and take my part in the world of practical activities. The solitary enjoyment of the infinite in the meditation no longer satisfied me, and the test which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self-realisation in the life of man through some disinterested service."

কবির রচনা সম্বন্ধে এই ধরনের অভিযোগ আছে যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তব-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পগুলি একান্তভাবে কল্পনার দান। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ অতিশয় ক্ষীণ। কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এই অভিযোগের বিচার যুক্তিতর্কের অপেক্ষা

রাখতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে এই মতবাদ একেবারেই খাটে না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার হীরকখণ্ডস্বরূপ। পদ্মাতীরে বাঁধা বজরার ছাদ বা গবাক্ষপথ থেকে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের যে গভীরতম অন্তস্তলবাহী স্রোতের প্রবাহ দেখেছেন তারই অখণ্ড শাশ্বত পরিচয় বয়ে গিয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যে সব মানুষ আসা-যাওয়া করেছে তারা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দুঃখে-সুখে, বেদনা-নৈরাশ্যে বিজড়িত, কিন্তু এসবের মধ্যে থেকেও রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন নিতান্ত ব্যক্তিগত পরিচিতির সীমানা-ছাপানো তাদের ব্যাপকতর, গভীরতর মানবত্ব। তাঁর ছোটগল্পে "সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না সেখানে তাহারা কথা কহিয়াছে, লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহারা একান্ত অনাবশ্যক সেখানে দেখি তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা ও আত্ম-বিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বাস্তবকে গ্রহণ করেছেন তাই নয়, বাস্তবের অন্তরে অবগাহন করে তার মর্মগত আত্মিকরূপও আবিষ্কার করেছেন। বাস্তবের সমস্ত ক্ষুদ্রতা আর আত্মবিরোধের মধ্যে তিনি একটা অখণ্ড অমলিন ঐক্যযোগের আভাস পেয়েছেন। জীবনের ক্রূর কুৎসিত দিক তিনি দেখেছেন, কিন্তু সেইখানেই তাঁর দৃষ্টি থেমে যায়নি। জীবনের মলিন দিকের কথা, মানুষের স্খলন-পতন-ত্রুটির কথাও স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে। কিন্তু তিনি জেনেছেন সেইগুলিই তাদের শেষ কথা নয়। অসুন্দরকে পদে পদে পার হয়ে সৌন্দর্যের অমরাবতীতে সত্যের আলোকে পৌঁছেছিল তাঁর দৃষ্টি।

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে ;···
তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি ;
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

কবির পুরাতন ভৃত্য "অতি পোশান্ত কৃষ্ণকান্ত", নিজের ভৃত্য সেলিম মিঞা, পশ্চিমা মজুরের মেয়ে, দিদির স্নেহ, মূঢ় পশুর ভাষাহীন নির্বাক্ হৃদয়, চারি বৎসরের কন্যাটির "যেতে নাহি দিব"; 'কাহিনী' গ্রন্থের পতিতা, 'চৈতালী'র করুণা ও সতী, 'চতুরঙ্গে'র ননীবালার কাহিনী, ঠিকা মুহুরীর কাহিনী, 'পোস্টমাস্টারে'র

রতনের কাহিনী, 'পলাতকা'য় বাইশ বছরের রোগিণী, প্রণয়ভীতা প্রমিতা এবং আরও বহু জায়গায় আপাতত যা অতি ছোট অতি তুচ্ছ, মনুষ্যত্বের এবং মানবতার সুবৃহৎ অধিকারে বঞ্চিত, তারা আমাদের সামান্য গৃহের সামান্য প্রাণী হলেও বিশ্ব-নিখিলের অধিবাসী। এদের দুঃখ-সুখের সঙ্গে কবি আপন বেদনা ও কল্পনাকে যুক্ত করেছেন বাণীর সূত্রে।

৪

এই মাটির পৃথিবীর অশ্রুজল বেদনা সমস্ত অন্ধকার সত্ত্বেও তাঁকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। বসন্তে তিনি শুধু নবপল্লবেরই জয়গান করেননি, ঝরাপাতার মর্মরও তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে—

ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা এক অখণ্ড অদ্বৈতের উপলব্ধির আনন্দ, জগৎ ও জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং শতলক্ষ তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার অনুভব। যা অতি নগণ্য তার মধ্যেও তিনি অসীমের মূর্তি দেখেছেন। সমস্ত প্রকাশই যে একটি বিরাট আনন্দময় সত্তার অভিব্যক্তি এই উপলব্ধির রসে তিনি তন্ময় ছিলেন। তাই জগৎকে মিথ্যা মায়াময় বলে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হননি।

কবি বহুবার বলেছেন—"আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে। যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে। জন্ম দিই কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে। এই জন্য স্বর্গের ওপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরও বেশি ভালবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই। কবি আরও বললেন—

জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে।

৫

কবির অধ্যাত্ম-জীবনের কাব্যগুলিও মানবীয় রসে অভিসিঞ্চিত। কবি প্রথমেই গাইলেন—"সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে"। তারপর—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে। ('গীতাঞ্জলি')

তাই তিনি সাধককে বললেন, তীর্থে বা দেবালয়ে ভগবানকে খুঁজে পাবে না, তাঁকে পেতে হলে যেতে হবে সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে। অরূপ সুন্দরকে নিখিল বিশ্বের বিচিত্র রূপের মধ্যেই প্রকাশিত দেখা যাবে। তাই ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীকে বললেন—

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস। (ঐ)

সাধারণ, অতি-সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সমবেদনা প্রীতি যে কত আন্তরিকতায় পূর্ণ ছিল তা শুধু ভাষায় ব্যক্ত করবার নয়, এদের প্রতি তাঁর ব্যবহারই যথেষ্ট প্রমাণ। যারা মূঢ় ম্লান মূক, যাদের শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক—তাদের লাঞ্ছনা-অপমান, বা তৎসভার গ্লানি কবিকে ব্যথিত করেছে, চঞ্চল করেছে। মানুষের অধিকারে যারা বঞ্চিত তাদের এই অসহনীয় অপমান কোন প্রাণেই সয় না। তাই তিনি বলেছেন—

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। (ঐ)

ভারতের পুণ্য মহামানবতীর্থে নরদেবতাকে পরম প্রণতি না জানালে এই দুঃখ-দুর্গতির অবসান নেই। তাই—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে। (ঐ)

"দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা"—এই ছিল তাঁর সারা জীবনের চিন্ময় সাধনা। তাই বার বার একই কথা বলতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি যে, বনে বিজনে আপন মনে বিশ্ববিমোহনের সঙ্গে জানাশোনা হবার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ তিনি যে সকলকে নিয়েই পূর্ণ। বিশ্বজনের পায়ের তলায় যে ধূলিময় ভূমি পড়ে আছে সেই তো স্বর্গভূমি, আর সকলের সঙ্গে মিলনে যে অসীম আনন্দ সেই তো বিশ্ববিধাতার পরম পরিচয়।

সবার নীচে, সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি—
সেই তো আমার তুমি। ('গীতালি')

কবি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে আত্মস্বীকৃতিতে এই কথা বলে উপসংহার করেছেন—"যিনি সর্বজগদ্গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে লোকালয় ত্যাগ করো, গুহা-গহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও। এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই, অন্তত আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে, তিনি নিখিল-মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই! কেননা আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাঁকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন?

"এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্ম-বিনয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক্ করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"

কবির শেষের অধ্যায়ের কবিতা, বিশেষ করে 'রোগশয্যা', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা'র কবিতাগুলি মানুষকে আরও নিবিড় করে পাওয়ার ব্যাকুলতায় ভরা। শান্ত পরিণত গভীর দৃষ্টি নিয়ে শেষের দিনটিতেও কবি এই বলে গিয়েছেন—

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়। ('শেষ লেখা')

কবির একতম ভালবাসার পাত্র ছিল প্রিয়তম মানুষ। সর্বসংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার বেদীতেই চিরকাল অর্ঘ্য বহন করে এসেছেন। এই সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছিল তাঁর পরিণত বয়সে, নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুসন্ধানের ফলে।

কবি বহুবার ঘোষণা করেছেন—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব মানবজন্মের গৌরব। সুখ-দুঃখে অনন্তমিশ্রিত প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় উদাত্ত কণ্ঠে প্রাচীন ঋষিদের মত কবি গেয়েছেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী। ('আরোগ্য')

কবি সুগভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা, প্রেম ও প্রণতি জানিয়ে গিয়েছেন মানবরূপ মহামানবের উদ্দেশে—

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি—
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি। (ঐ)

# রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই ; আমি সাধুও নই। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথে প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" এর থেকে বড পরিচয় কবির নেই সত্যি, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলী গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে এই সত্যে উপনীত হতে হয় যে, কবির বিশ্বৈক্যানুভূতি, সর্বজনীন ভাব ও আদর্শপ্রীতি, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যধ্যানের উদ্ভব হয়েছে তাঁর গভীরতম অধ্যাত্ম-অনুভূতি থেকে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য। মুখ্যত তিনি কবি হলেও অধ্যাত্ম-অনুভূতি, দার্শনিক অনুসন্ধান তাঁর রচনাবলীর একটি বিশাল ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। তাঁর 'শান্তিনিকেতন' ও 'ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি, পত্রালাপ, দার্শনিক আলোচনা ইত্যাদি বহু ছোট-বড রচনার মধ্যে অধ্যাত্ম-প্রেরণাই সর্বপ্রকারে বড হয়ে উঠেছে। 'মানুষের ধর্ম' হিবার্ট বক্তৃতা একটি অমূল্য দার্শনিক রচনা। এ ছাড়া বহু কাব্যে, নাটকে, বিশেষ করে রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটকে দার্শনিক তত্ত্ব তাদের আধেয়, অধ্যাত্ম-অনুভূতি তাদের প্রাণ-কণিকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের প্রত্যেকটি পাতা খুলে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, যে ভাবে তিনি কাব্যানুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই ধর্মানুপ্রেরণাও লাভ করেছিলেন। 'আত্ম-পরিচয়ে' এ কথার স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটা পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে…আজ বুঝিয়াছি সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবতাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান, শুধু কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন তাহা নহে।…আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি,

আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন, তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।" ইনিই কবির সর্বপ্রকার অনুভূতির উৎস, সৃষ্টির প্রেরণা, জীবনের আলো, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা। কবির যা কিছু মর্ম-কর্ম সবকিছুর দেবতা এই অন্তরতম। কবির সঙ্গীতে, কাব্যে যা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে তা এই অন্তরতমেরই পূজার জন্য। কবির কথিত এই দেবতাই তাঁর "ক্ষণিক খেলার লাগিয়া" প্রতিদিন বাসনার সোনা গলাইয়া নিত্য নূতন মূরতি গঠন করেছেন।

কত যে বরন, কত যে গন্ধ
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসরশয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্য নব।

("জীবনদেবতা"—'চিত্রা')

হয়তো তাই, হয়তো অন্তরের মধ্যে সুতীব্র একটি অনুভূতি দেবতারূপে তাঁর সমগ্র জীবনের অধীশ্বর হয়ে বসে আছেন।

কবির আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ চিরপ্রচলিত রীতির মাপকাঠিতে ফেলে বিচার করতে গেলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে, এবং কবিকে ভুল বোঝবারই সম্ভাবনা থাকবে বেশী। কারণ তাঁর মানসিক গঠন কবির ধর্ম অনুযায়ী, তা ভাবপ্রবণতায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায়, নিত্য নূতনের বিপুল সম্ভাবনায় চির-ভাস্বরময়। দার্শনিকের শুষ্ক নীরস তর্ক বিতর্ক এখানে বিশেষ স্থান পায়নি। দার্শনিক যে পথে পরম সত্যের সন্ধান করেন সে পথ কবির নয়। দার্শনিকের সত্যানুসন্ধান-মার্গ বিচারমার্গ, যুক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ। কবি সমগ্র জীবন ধরে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল বিশ্বজীবন ও বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্বজীবন থেকে তিনি যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সেই আকুতিই তাঁকে ধর্ম-জীবনের সত্য উপলব্ধি করতে আগ্রহ জুগিয়েছিল।

কোন শাস্ত্র বা পুঁথি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম সঞ্চয় করতে চাননি। শাস্ত্র, গুরু

বা কোন বিশেষ মার্গ তাঁকে কোন নির্দিষ্ট পথে বাঁধতে পারেনি। তাঁর কথা, "পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।" আরও বলেছেন, "ওদের কথা ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি। তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবি সোজাসুজি।" এই প্রসঙ্গে কবি নিজে বলেছেন—"আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্ম দান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। যা মুখে বলছি বা লোকের মুখে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমাদের পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেবতাকে এ সংসারে সকলের মধ্যে সকলের দেবতারূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছেন। সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মের উপলব্ধির উপরই কবির আধ্যাত্মিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত।

জীবনের এই সত্যানুভূতির সঙ্গে প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অনুভূতির যেখানে সংযোগ হয়েছে সেইখানেই শাস্ত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কবি অনুভব করেছেন—

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী—
সঞ্জীবনী স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভর
অনন্ত অমৃত বার্তা।
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ। ('নৈবেদ্য')

অতীতের ঋষির অমৃতবাণীকে জীবনে ও কাব্যে সঞ্জীবিত করে তোলবার প্রেরণাই বোধ হয় দর্শনরচনায় তাঁকে প্রণোদিত করেছিল।

উপনিষদের শিক্ষা তাঁর মানসধর্মকে পরিপুষ্ট করেছিল। উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত ও শ্রেষ্ঠবিদ্যা। উপনিষদকে ভিত্তি করে ভারতের সমস্ত দর্শন-শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। সাধকের গভীরতম অধ্যাত্ম-অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশ এই উপনিষদ। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাব আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন। অনিত্যের

মধ্যে তাঁকে নিত্যরূপে ধ্যান করবার কথা উপনিষদেই পাওয়া যায়। উপনিষদের সাধনা অন্তর্মুখীন ধ্যানপরায়ণ অধ্যাত্ম-যোগসাধনা। কবি বলেছেন—"বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্ব-ভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্ম। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও আমি তাঁর সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনি আমাদের মধ্যে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে। এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিল।" উপনিষদের ভাব অন্তরে চিরমুদ্রিত হয়ে যাবার একটি প্রধান কারণ এই হতে পারে যে, উপনিষদের বাণী কোন বিধিনিষেধের বা কোনরকম সঙ্কীর্ণ মতবাদের দ্বারা সীমিত নয়। উপনিষদের ধর্মবুদ্ধির প্রাখর্য বা যুক্তিতর্ক বিচারের সূক্ষ্ম গণ্ডীর মধ্যে বাঁধাধরা নয়। চিরবন্ধনমুক্ত স্বাধীনতার রূপ; মানুষের নির্মল চেতোদর্পণে মাঝে মাঝে তার শুভ্র জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। এইখানেই উপনিষদের সঙ্গে কবির অন্তরের গভীর মিল।

পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহচর্য, উপনিষদের অধ্যাত্ম-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমাহিমার জ্ঞান এবং অখণ্ড বিশ্বানুভূতি, অনন্ত সম্ভাবনীয়তা জীবনের প্রথম থেকেই এমন গভীরভাবে কবিচিত্তে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তী কালে সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত বিশ্বজনীন ভাব ও আদর্শ তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বহুল পরিমাণে গঠিত করেছে এবং একটি বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টির অধিকারী করেছে। ভগবান, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ উপনিষদের ঋষি যে ভাবে অনুভব করেছেন, রবীন্দ্রনাথও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবেই ভাবিত হবার উপযুক্ত পথ পেয়েছিলেন। উপনিষদের এই জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবানের সন্ধানের বিশ্ব-অভিসারে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর যাত্রাপথের পাথেয় ছিল ভক্তি আর প্রেম।

কবির অধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তিভূমিতে আমরা দেখি দুখানি শ্বেতপ্রস্তর—একটি উপনিষদের শিক্ষা, অপরটি বৈষ্ণব লীলাবাদ। বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের প্রথম কথা, নারায়ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু। মানুষের আত্মরূপিণী প্রবাহিণী কখনো

সরল পথে, কখনো বক্র পথে, কখনো উপলখণ্ড অতিক্রম করে নিরন্তর সেই রসামৃতসিন্ধুর উদ্দেশে প্রধাবিত। তাই হৃদয়কুটীরে ক্রন্দমানা মহাভাবস্বরূপিণী বিরহিণী রাধা নিত্যকাল ধরে গোলোকবিহারী রসসিন্ধুর অভিসারে চলেছেন। বৈষ্ণবদের মতে সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ (পরমেশ্বর) সৃষ্টির আন্তর সত্তাকে (শ্রীরাধাকে) নিরন্তর তাঁর অমোঘ বংশীধ্বনির দ্বারা আকর্ষণ করছেন। বৈষ্ণবদের কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং এবং এই বিশ্ব-চরাচর অঙ্গভা, দেহ-কান্তি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এই দ্বৈত কল্পনা থেকেই ভক্তি। ভক্তি গাঢ় হলে প্রেমের উৎপত্তি। তাঁরা বলেন, ভগবান অনাদি অনন্ত নির্বিকল্প হয়েও প্রেমে অন্তের মধ্যে ধরা দিয়েছেন। সেই জন্মই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" "সকল সীমাকে রন্ধ্র করিয়া সেই অনন্তের বাঁশী তাই নিরন্তর বাজিতেছে এবং তিনি বার বার জীবনের নানা গোপন নিগূঢ় পথ দিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে কত দুঃখ ক্লেশ কত আঘাতের অভিঘাতের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সমস্ত জীবনের এই সুখ-দুঃখবিচিত্র পথ তাঁহারই অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন, এই পথেই কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই যে বিশ্ব ও মানবজীবনেব সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ইহাই সারকথা।"

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় এই সুরই শোনা যায়। তিনিও প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি করেছেন শুধু নিজের অন্তরে নয়, বিশ্বপ্রাণের মধ্যে। এই প্রেম সীমায় সীমিত নয়, অসীমে পরিব্যাপ্ত।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মতত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— "আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে ভক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে, যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বেব অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"

এই বিশ্ব তাঁরই আনন্দময় সত্তার অভিব্যক্তি। তিনিই তো "রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে" পরিব্যাপ্ত হয়ে আপনার মাধুরী আপনি আস্বাদন করেন। এই সত্যের সম্মুখীন হয়ে কবি উপলব্ধি করলেন, যিনি জীবন-

দেবতা তিনিই বিশ্বদেবতা। তাই ভগবান, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের মধ্যে কোন মূল প্রভেদ নেই। এক অখণ্ড জ্ঞানময়, আনন্দময ব্রহ্মেব বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তি। উপনিষদের এই তত্ত্বকে কবি জ্ঞানের দ্বারা বা বোধের দ্বারা গ্রহণ করেননি; গভীর উপলব্ধির দ্বারা আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছেন। এই সুনিবিড় অধ্যাত্ম-অনুভূতি কবির সমগ্র রচনাকে নিয়ন্ত্রিত কবেছে।

কবি তাঁর ধ্যানের নয়নে এই সৃষ্টিব মধ্যেই সেই একবর্ণ শুভ্র নিরঞ্জন দেবতার স্পর্শ জীবনে বহুবার লাভ করেছেন, যাঁর কৌতুকলীলা তাঁর হৃদয়ে রসেব ভাবপ্রস্রবণ এনেছে, তাঁকে অসীম রহস্যেব মধ্যে ফেলে ভাবিত কবে তুলেছে। কবিব জীবনে এই এক পরম উপলব্ধি যে, যে শক্তি এই বিশ্বেব মধ্যে লীলা করছেন তিনি সকল দেশ-কাল, সকল মন ও বস্তুতে বিরাজিত। বাইরে যিনি বহুবিচিত্র, অন্তরে তিনি একা, একাকী। আবার অন্তরে যিনি এক, বাইবে তিনি চঞ্চলগামিনী।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
... ... ...
অন্তর-মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারিদিকে চির যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি—
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অচপল দামিনী। ('চিত্রা')

এমন তন্ময়তা একমাত্র বৈষ্ণব তত্ত্বেই দেখা যায়, তাঁরা ধ্যাননয়নে দেখেছেন—"যাঁহা যাঁহা নেত্র স্ফুরে তাঁহা কৃষ্ণমূর্তি।" তাঁব সম্বন্ধে এই ভাব আনতে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না, দিন-ক্ষণের অপেক্ষা করতে হয় না বা দূবেও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। অন্তরে ব্যাকুলতার সঞ্চার হলে, তাঁকে উপলব্ধি করবার যথার্থ এষণা জন্মালেই নিঃশ্বাসেব মধ্যে তাঁর আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁর আনন্দ সুকম্পিত হয়। কবি এক জায়গায় লিখেছেন, "উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল।...এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক।...আমি যার

অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হলে এই মুক্তি।··· সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল···তিনি সেই অখণ্ড মানুষ, যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব। সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।"

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবির মগ্ন-চৈতন্যের সঙ্গে যে সংগ্রাম, তা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল এসে 'প্রভাতসঙ্গীতে'। 'প্রভাতসঙ্গীতে' এসে কবি উপলব্ধি করলেন, আমরা যখন অহং-বোধটাকে একান্তভাবে আঁকড়ে থাকি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে চ্যুত হই। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ, চরম বেদনা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবি নিজের ব্যক্তিগত বেদনায় হয়ে উঠেছিলেন নৈরাশ্যধর্মী, জগতের প্রতি অনাস্থা তাঁকে বৃহৎ সত্যের সম্মুখীন হতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীতে' সহসা—

আজি এ প্রভাতে রবির কর<br>কেমনে পশিল প্রাণের 'পর—

যেদিন সুপ্ত চেতনা আলোর পরশ পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল সেদিন রুদ্ধ কারার দ্বার খুলে জীবন ও জগতের বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগে যুক্ত হবার জন্য প্রাণের অধীরতা কবিকে ব্যাকুল করে তুলল। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে—সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার না করে, সমস্তকে স্পর্শ করে তা মিলিত হতে চায় তাঁর পদপ্রান্তে। কবি বার বার উপলব্ধি করেছেন, "মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস তাঁকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল। ···তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে।···সেদিন দেখেছিলেম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই।···স্থূল আবরণে মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।" যখন আমরা অহংবদ্ধ হয়ে খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে চলি তখন মৃত্যু ভয় দেখায়; কিন্তু সমগ্র দৃষ্টির মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকা নেই, সেখানে চিরন্তন লীলার ছন্দে সবই ছন্দিত। বিভেদের মধ্যে সেই একেকে না পেলে মনের সুখ শান্তি মঙ্গল নেই, তার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণেরও শেষ নেই। ধ্রুব একের সঙ্গে যোগে যুক্ত না হতে পারলে নানা বেদনা ও

বিপত্তির দ্বারা আহত, পীড়িত, বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াতে হয়। জেনে হোক না জেনে হোক মানুষ নিরন্তর সেই পরম ঐক্যের, পরম সত্যের, পরম আনন্দের সন্ধান করে ফেরে। সেই পরমবাঞ্ছিত বস্তুটিও নিশ্চল নির্বিকল্প হয়ে বসে থাকেন না। যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলে আসছে এবং যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি জীবন পূর্ণতর হয়ে উঠছে, সেই পথেই তিনি সঙ্গীরূপে, পথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে আসেন। এই জীবনের সঙ্গে তাঁর এইভাবেই নিত্য লীলা চলে

সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে।

মিলনের প্রতীক্ষায় তিনিও বেদনাবিধুর। তাই কবি বলেছেন, "তোমায় আমায় যে চাওয়ার সম্বন্ধ সে তো আজ থেকে নয়, অনাদি অতীত অনির্দিষ্ট কাল থেকে তিনি পরম দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য একটা গভীর গোপন আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে ধায়
জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে।

*  *  *

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে। (গীতাঞ্জলি)

এই অভিসার এক সত্যের কেন্দ্রাভিমুখী। এই সত্যই কবির জীবনবেদ।

পরস্পর পরস্পরকে পাওয়ার আকিঞ্চন উভয় পক্ষেরই সমান—দুজনেই মিলনপিয়াসী। মিলনের এই পথে যত বাধা-বিপত্তিই থাক্ না কেন তবু তা আনন্দঘন। দয়িতের এই গোপন অভিসার কবির কাছে প্রকাশিত, তাই কবি বলেছেন—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে। ('গীতাঞ্জলি')

সৃষ্টিকে, মানুষকে তাঁর যে একান্ত প্রয়োজন। তার মধ্য দিয়েই যে সেই পরম রসো ইব সঃ আত্মরস আস্বাদন করবেন। কবি বলেছেন—

আমি এলেম, এল তোমার ফাগুনভরা আনন্দ—
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল
নইলে তো এই সূর্য তারা সকলি নিষ্ফল। ('বলাকা')

শুধু একটু দেখবারই জন্য কৌতূহল? আর কিছু নয়? প্রেম নয় প্রীতি নয়, কিছু নয় আর?

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে,
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মোহন বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে অসীম তাঁর ব্যাকুল বাঁশরী সর্বদাই বাজিয়ে চলেছেন। কত বর্ণ গন্ধ গানে সেই অরূপের সঙ্গে রূপের লীলায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে সত্যসুন্দর, পরমমনোহর।

বিশ্বের সবার মাঝে হে বিশ্বরাজন,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে,
কত শুভদিনে, কত মুহূর্তের 'পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ।

একথা বার বার বলতে কবি উল্লসিত, ক্লান্তিবিহীন। তাই নিত্য নূতন সুরে তিনি গেয়ে গিয়েছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর। ('গীতাঞ্জলি')

আমার মধ্যে যদি তোমার রূপের নিত্যলীলা না হয় তবে যে জীবনের সবই অধন্য হয়ে যাবে। আমার এই জীবন যদি তোমার রূপলীলার বাহনস্বরূপ হয়ে থাকে তবেই জীবনের সার্থকতা, তা না হলে—

এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও।

কবির এই অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রথম অবস্থায় আমরা দেখি, কবি উপলব্ধি করেছেন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক পরম সত্তার বিকাশ। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের যে নিগূঢ় যোগ তা স্থির অচঞ্চল, এর মধ্যে কোন দ্বৈত নেই, তাই কবির কাছে বৈদান্তিক মতের কোন অর্থ নেই। তিনি পূর্ণ অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদকে কখনো গ্রহণ করেননি। বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত এই যে, তা বহু রূপে প্রকাশিত হলেও মূলতঃ এক। সেই একই শক্তির লীলা চলে দ্বতবোধের ভিত্তিতে। দ্বৈতবোধের একদিকে আছে ব্যক্তিবিশেষ আর একদিকে আছে বিশ্ব। এই বিশ্বেরও স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তাও ব্যক্তিগুণ-বিশিষ্ট এবং তার সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা ভালবাসারই। রবীন্দ্রমানসের এই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি নিত্য ও অনিত্য, অনন্ত ও সান্ত, রূপ ও অরূপ, জড় ও চিন্ময়—মিশ্রিত সৃষ্টিকে সমানভাবে উপভোগ করেছেন। একটি কেন্দ্রগত অনুভূতি থেকেই এই ভোগ তাঁর পক্ষে সহজ ও সরল হয়েছে। এইজন্যই রবীন্দ্র-সাহিত্য নিতান্ত বাস্তবমুখী হয়নি অথবা একেবারে ভাবগগনবিহারীও হয়নি, উভয়ের সমন্বয়ে তা হয়েছে অপূর্ব।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসভার "মালাকর", সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একান্ত ভক্ত, একনিষ্ঠ উপাসক। তিনি রূপশিল্পী, সুরসাধক, রসরসিক। প্রকৃতির রূপ রস গান তিনি উপভোগ করেছেন পরিপূর্ণভাবে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির অসীম অনন্ত অনির্বচনীয় সৌন্দর্যও তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের পশ্চাতে রয়েছে চিরসুন্দরের অঙ্গদ্যুতি, অনন্ত আদি রূপের সত্তা—এ কথা বহুবার তাঁর কাব্যে উচ্চারিত হয়েছে। মানুষকেও কবি এক অখণ্ড সত্যের অংশরূপে দেখেছেন। কবির কাছে এই পৃথিবী তীর্থদেবতার মন্দির। তাঁর স্বদেশ মহামানবের সাগরতীর্থ বলে ভারততীর্থ। কবি তাঁর স্বদেশকে বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি মনে করেছেন—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কী বেশে?
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

কবি ছোট-বড় সকলের মধ্যে চিত্তের স্থাপনা করতে চেয়েছেন। কারণ—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

রবীন্দ্রনাথের মানব দেশ-কালের অতীত বিশ্বমানব, জীব-সংস্কারের উর্ধ্বগত 'চিরন্তন মানব। এই চিরন্তন মানব না হলে চির আনন্দময়ের লীলা সার্থক হয় না। তাই শ্রীভগবান বললেন—"একোঽহং বহুস্যাম্"। মানুষের প্রেম ভক্তি স্নেহে তিনি নিজের আনন্দ অংশ উপভোগ করতে চান। মানুষ যেমন তাঁকে প্রেম নিবেদন করবার জন্য ব্যাকুল, তিনিও মানুষের প্রেমের জন্য নিত্য কাঙাল।

এমনি করেই কত দৃশ্যে, কত গন্ধে, কত রসে সেই অদৃশ্য অনির্বচনীয় পরম রসকে তিনি বার বার উপলব্ধি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জগৎ চিরবহমান, চিরপরিবর্তমান জগৎ। "লুটে যাবার ছুটে যাবার চলবার আনন্দে" সে অধীর। কাজেই এই জগতের যিনি স্বামী তিনিও নির্বিকল্প নির্গুণ ঈশ্বর নন—তাঁকেও চলতে হয় নিরন্তর গতিবেগে। যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর মানুষের এই যাত্রাপথে তিনিও চিরসঙ্গী হয়ে পথিক-রূপে চলেছেন। কোন্ অনাদি কাল থেকে তিনি বেরিয়েছেন তা কে জানে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর দর্শন মেলে। ঝড়ের রাতে তাঁর অভিসার হচ্ছে, কুজন-হীন কাননপথে তাঁর দেখা মিলছে, অজানার বীণাধ্বনি বাজছে, মেঘের জটা উড়িয়ে কার অকস্মাৎ আবির্ভাব হচ্ছে, প্রভাতের আলোর ধারা কার নত মুখের উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঋতুতে ঋতুতে সেই নবীন পথিক নব নব রঙীন বেশে দেখা দেয়। শুধু কি তাঁর মনোহর বেশ—শুধু কি "অরুণবরণ পারিজাত হাতে" নিয়ে সোনার রথে তাঁর আবির্ভাব হয়! রুদ্রমূর্তিতেও সে কতবার চেতনার বেদনা জাগাতে আসে—সে রূপ তার ঝড়ের বেশ, মৃত্যুর বেশ। এমনি করে—

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে—
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে।
এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,

এসো সকল কর্ম অবসানে—
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

তিনিও ব্যাকুল-করা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছেন আর মানুষ সেই বংশীধ্বনি শুনে আত্মবিস্মৃত হয়ে ছুটে চলেছে মিলনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায়। ক্ষণমিলনের আশা, প্রদীপ্ত কামনা পথ-চলাকে করেছে সুন্দর মধুময়। তাই কবি চিরযাত্রার চিরপথিক হতে চেয়েছেন। কারণ, এই অভিসারের পথেই যে তাঁর চিরদয়িতের সঙ্গে মিলন ঘটবে। এই পথ-চলার নেশা, ক্রমাগত অগ্রসর হবার মোহ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিমানসকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার কারণও এই মনে হয়। তাই দেখি কবির ভগবান চিরদিন নিত্য নবীন লীলারঙ্গে মত্ত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে তাঁর লীলার অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই পরমরসিক লীলাময়কে বুঝতে হলে বিশ্ব-লীলাতত্ত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধির বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য ঐশ্বর্যময়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অতি প্রত্যুষকাল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত নব নব আনন্দ, বেদনা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে নব নব রূপে ও রসে এই চির-চঞ্চল লীলাময়ের লীলাকে উপলব্ধি করেছেন। ভগবান চিরপথিক, চির-অগ্রসরমাণ, চঞ্চলের চিরসাথী, সুদূরের পিয়াসী, নিরুদ্দেশের যাত্রী। কবিও তাঁর জীবনদেবতাকে পথিকের চঞ্চল সঙ্গীরূপেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন—

আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।

অবগুণ্ঠিতা যখন কবির সুখনিদ্রা ভাঙিয়ে "সিন্ধুপারে" নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন কবি দেখলেন—

অফুরান পথ, অফুরান রাতি,
অজানা নূতন ঠাঁই…

কিন্তু সব সংশয় সব ক্লান্তি দূর হল,—দেখলেন সেই চিরপরিচিত মধু-মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধা-ভরা আঁখি, যে চিরদিন কবির সঙ্গে লীলা করে এসেছে।

খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।

কবি নিবিড়তম অনুভূতির দ্বারা বুঝেছেন—

হে মহা পথিক অবারিত তব দশদিক—
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম, নাইক চরম পরিণাম,
তীর্থ তব পদে পদে, চলিয়া তোমার সাথে
মুক্তি পাই চলার সম্পদে।

এই চলার প্রেরণা, দুর্নিবার আকর্ষণ কবির মনে কোনদিন শিথিল হয়নি। তাই তাঁর শেষ গানেও শুনতে পাই—

কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে থাকতে যে চায় অটল হয়ে।
জানি যারা চলার ধারা নিত্য থাকে নূতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে।

দেবতার মূর্তপ্রতীকস্বরূপ বিশ্ববাসীকে প্রণাম করে কবি তার দেবতার চরণে শেষ পুষ্পাঞ্জলি দান করলেন এবং আরতি-সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দিলেন—

এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণে, বরিষণে,
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপ-শিখা
এনেছিল মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এসেছে প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছে চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বার বার চোখে পড়ে যে, তিনি কোন দিন কোন চরম অবস্থাতেই তৃপ্ত হননি। অধ্যাত্ম-সাধক চান পরিপূর্ণ মিলন, সকল দুঃখ-বেদনার চরম ফলস্বরূপ মহানন্দময় পরিপূর্ণ মিলন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনা অন্য ধারায় প্রবাহিত। তিনি নির্দিষ্ট কোন কিছুই চাননি, নিত্য নূতন সাধনার বেদনামাধুর্য, নব নব অনুভূতির জন্য তাঁর চিত্ত লোভাতুর।

সেই তো আমি চাই—
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।
এমনি করে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।

"চিরন্তন পথিকের মনোবৃত্তি তাঁকে কোন সীমাতেই বাঁধতে পারেনি, তাই পূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণের পরেও একটা অতৃপ্তির সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।"

শেষ বিদায়ের কালে কবি প্রার্থনা করেছেন তাঁর সত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হোক, চরম আত্মোপলব্ধি হোক—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ
সর্বমানুষের মাঝে।
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।

তাই কবির শেষ জীবনের কাব্যে কল্পনার কোন লীলাবিলাস নেই, বিচিত্র ছন্দের মনমাতানো নৃত্য নেই, চিত্তবিনোদনের ছলাকলাও নেই—আছে জীবনের সত্যদর্শনের নিরাভরণ বাণীরূপ, নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বল্পাক্ষর মন্ত্রের উচ্চারণধ্বনি।

চিরকাল উপনিষদের রসপুষ্ট কবি, আসন্ন বিদায়ের কালেও উপনিষদের বাণীকে উপলব্ধি করে ঋষির মত বিক্ষোভবিহীন সহজ অথচ গভীর আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে জয় করে অমৃতলোকে তাঁর মহান প্রয়াণ হয়েছে। এই সময়ে কবির দেহেরও একটা পরিবর্তন হয়েছিল—সে কথা শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"এই নয় মাসে ধীরে ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল,

তাঁকে ইদানীং মনে হত তপঃক্লিষ্ট ঋষি। আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্য দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা।"

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—"মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া কবি আর সেই পূর্বেকার কবি নন, গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক নন, অনিত্য জগৎ ও জীবনে নিত্যের লীলার বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ভাবুক নন, তিনি একেবারে অধ্যাত্ম-সত্যদ্রষ্টা ঋষি। আত্মোপলব্ধিই তাঁর শেষ লক্ষ্য, ভূমার চির জ্যোতির্মণ্ডলে তাঁহার চরম বিশ্রামস্থল। বিচিত্র রূপস্রষ্টা, সঙ্গীতস্রষ্টা, সৌন্দর্যস্রষ্টা, জগৎ ও জীবনের বিপুল রূপরসভোগী কবি, এ সংসার ও মানবজীবনকে ছায়া মনে করিয়া আত্মাকেই একমাত্র সত্য জানিয়া এ ধরণী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।"

# রবীন্দ্র-কাব্যে দুঃখানুভূতি

১

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

("কঙ্কাল", 'পূরবী')

উপনিষদের সন্তান রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই এই আনন্দের সুর ধ্বনিত হতে পারে। রবীন্দ্র-কাব্য-দর্শন তথা জীবন-দর্শনের মূল সুর "আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি"—বিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে সবই আনন্দময়ের দ্বারা আবৃত। উপনিষদে আছে "স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" "তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগেব পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিযা। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিযাই বহন করিতেছি। তাঁহাবই তপেব তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে। সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড দুঃখকে বহন করিবে কে?" তপের দ্বারা তপ্ত হয়ে বিশ্বসৃষ্টির কথা আমরা কবির 'বলাকা' কাব্যেও দেখতে পাই। দুঃখ-তপস্যার এই আনন্দ-তত্ত্ব কবি প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিযা'ছ আজি এ মাধবী—
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের অাঁচলে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনার সাধক রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে একটি মানসিক দুর্বলতা বলে গ্রহণ কবেননি, বা এর অনিত্যত্ব সম্বন্ধেও তাঁব মনে কোন দ্বিধা আসেনি, তিনি দুঃখকে দেখেছেন সৃষ্টিব একটি মূল অঙ্গ রূপে। সৃষ্টির মূলেই যে দুঃখ। দুঃখ না থাকলে সেখানে পরিপূর্ণ আনন্দের জন্ম সম্ভব হয় না। দুঃখের গর্ভ থেকেই আনন্দের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথাই বলেছেন—"দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে

একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।...এ কথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ।...অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে, সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।" সৃষ্টির আন্তর সত্তা গভীর দুঃখ এবং সেই গভীর দুঃখই ভূমা, ভূমাতেই আনন্দ, অল্পে সুখ নেই—উপনিষদেব এই বাণী রবীন্দ্র-মানসক্ষেত্রকে যে বিশেষভাবে সিঞ্চিত আর উর্বর করে রেখেছিল তার প্রমাণ তাঁব জীবন-দর্শন। কবি মিলন অপেক্ষা বিরহের মধ্যে আনন্দ পেয়েছেন অধিক, বন্ধনেব মধ্যেই পূর্ণতার স্বাদ লাভ করেছেন, মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, রূপের মধ্যে অরূপ, সসীমেব মধ্যে অসীমের নানা ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ অনুভূতি তাঁব কাব্যে আমরা দেখতে পাই। দুঃখকে যদি তিনি নিতান্তই দুঃখ বলে জীবনে গ্রহণ কবতেন তবে জাবন ও জগতের এত বিচিত্র স্বাদ তিনি কখনই গ্রহণ করতে পাবতেন না। দুঃখ যে সৃষ্টির মূলীভূত কাবণ এবং এব মধ্যেই যে কল্যাণতম, সত্যতম আনন্দ-স্বরূপ বিরাজিত তা কবি মর্মে মর্মে অনুভব কবেছিলেন। তাই তিনি দুঃখসাধনার মধ্য দিয়েই সত্য-শিব-সুন্দবেব সাধনা কবেছেন।

মানুষের একমাত্র নিজস্ব জিনিস যা আছে তা তার এই দুঃখ। "আমাদেব পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয, তবে কি দিব, কি দিতে পাবি? তাঁরই ধন তাঁহাকে দিযা ত তৃপ্তি নাই, আমাদের একটি মাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে, তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ কবিতে হয়।" তাই কবি গৌরবের সঙ্গে বলেছেন—

দুঃখ যে তোর আপন জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিযে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

## ২

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যতীর্থ পরিক্রমণ করলে একটি জিনিস বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখবোধ। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে এই বেদনার সুর রণিত হয়েছে। প্রথম জীবনে দুঃখবোধের স্বরূপ পরবর্তী জীবনে একটি বিশেষ তাৎপর্যময় স্বরূপে রূপান্তর লাভ করেছিল। সেই জিনিসটিই এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব।

আনন্দের সঙ্গে এ কথা বলা যায় যে, ভগবান কবিকে রূপৈশ্বর্যে, ধনৈশ্বর্যে, আত্মীয-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব যাবতীয় সম্পদে ভাগ্যবান মহাপুরুষরূপে সৃষ্টি করেছিলেন যার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু তাঁর জীবনপঞ্জীর প্রতিটি পাতা খুলে দেখলে আমরা অভিভূত হয়ে যাই এই দেখে যে, তাঁর মত ভাগ্যহত পুরুষও বোধ হয বিরল। কবিব সুদীর্ঘ জীবনের চক্রপথে বহু খ্যাতি বহু যশ মান সম্ভ্রমেব অন্তরালে যে কত দুঃখ আঘাত বেদনা অপমান পুঞ্জীভূত হযে ছিল তা দেখলে স্তম্ভিত হযে যেতে হয। কিন্তু তাব জন্যে আশাবাদী কবিকে আমবা কোনদিন ম্লান বেদনাকাতর হতে দেখিনি। তাই তাঁকে আমবা বলি, তুমি আনন্দলোকেব কবি, তুমি সৌন্দর্যলোকের কবি, তুমি অনন্তের সন্তান, তাই তুমি অপাপবিদ্ধ, অম্লান জ্যোতিস্বরূপ।

৩

কবির জীবনেব বিচিত্র ঘটনাবলীব সঙ্গে পরিচিত হলে একটি জিনিস এই লক্ষ্য কবা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ অনুভূতি তাঁব সমগ্র কাব্যের অন্তরের অন্তস্তলে নিবরচ্ছিন্ন একটি ধারার মত প্রবাহিত হযে চলেছে। কবির দুঃখবোধ সেই সব অনুভূতিব অন্যতম।

প্রথম জীবনে কবিকে পর পব কযেকটি নিদারুণ মৃত্যুশোকের সামনে এসে দাঁড়াতে হযেছিল। এই মৃত্যুব আঘাত তাঁকে কিছুকাল বিমূঢ় করে বেখেছিল। জীবনের যে কোন মূল্য আছে, কোন মাধুর্য আছে সে সম্বন্ধে কবির মনে সংশয় দেখা দিযেছিল। মৃত্যু কবির জীবনের সব সজীবতা খণ্ডকালের জন্য নষ্ট করে দিলেও চিবকালেব জন্য তাঁকে উদ্ধাব কবেছিল। এই গভীর বেদনার মধ্য দিযে তিনি যে অমৃত লাভ কবেছিলেন তা অন্য কোনরূপেই পাওয়া সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কবে অথবা জীবনকে কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে দেখবার কোন উপায নেই। এ কথা অন্য কোন কবির কাব্য সম্বন্ধে বলা যায কিনা জানি না তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যে বলা যেতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাই আমরা দেখি কবির প্রথম জীবনের দুঃখবোধ বাস্তব জীবনেব সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল। তখনকার কাব্য আব নাটকের নামকরণ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়কার দুঃখ বেদনা যত না গভীর ছিল তাব থেকে বেশী ছিল উচ্ছ্বাসপ্রবণ। জীবনের সেই হালকা দুঃখকেই যেন মনে হত জীবনমরণময়। এই সময়কার কাব্য বা নাটক বিষাদাত্মক। এই বিষাদের

মধ্যে কোন গূঢ় অন্তর্বাহী আনন্দের ফল্গুধারার সন্ধান কবি তখনও পাননি।' এখানে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বও বিশেষ নেই, কবি এখানে অপেক্ষাকৃত নৈরাশ্যধর্মী বলা যেতে পারে। জীবনের এ একটা এমন অধ্যায় যখন জীবনে যাই আসুক না কেন তাকেই যথাসর্বস্ব বলে মনে হয়। দুঃখ এলে মনে হয় দুঃখই বুঝি জীবনের সব, আবার সুখ এলে মনে হয় পৃথিবীতে সুখ ছাড়া বুঝি আর কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে কবির একটি কথা মনে পড়ে। কবি লিখেছেন, " 'ভগ্ন-হৃদয়' যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে ওঠে।...সেই কল্পলোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল, তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।" যাই হোক, কবির কৈশোর-জীবনের যতগুলি রচনা আমরা পাই তার অধিকাংশই "বস্তুহীন ভিত্তিহীন" উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, এবং দুঃখবিলাস তাদের ভিতর একটা মস্ত জায়গা জুড়ে আছে, এবং সবগুলিই ট্র্যাজেডি। শুধু এইটুকু বললেই যেন এই রচনাগুলি সম্বন্ধে সবটুকু বলা হয় না, কোথায় যেন একটা না-বলা গভীর ইঙ্গিত রয়ে যায়। এই রচনাগুলি যে বিষাদাত্মক হয়েছে তার কারণ, কবির মনের কতকগুলি রুদ্ধ বাসনা প্রকাশিত হবার জন্য উন্মুখ অথচ প্রকাশের পথ পাচ্ছে না—তারই বেদনা রচনাগুলির ভিতর সঞ্চারিত হয়েছে। এই অব্যক্ত বেদনাই কবির জীবনের সব থেকে বড় বেদনা। এই মূল বেদনার জন্ম এই সব রচনাতেই হয়েছে এবং পরবর্তী জীবনে বিচিত্রভাবে রূপান্তর লাভ করেছে।

কবির 'জীবনস্মৃতি' থেকে আমরা জানি, কবির শৈশব অত্যন্ত কঠোর বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তাঁর ছিল না, অথচ প্রাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে কাছে পাওয়ার। এই অবরুদ্ধ হৃদয়বাসনা মুক্তিলাভ করল ছন্দের মধ্য দিয়ে—'বনফুল', 'কবি-কাহিনী' ইত্যাদিতে। কিন্তু তবুও হৃদয় শূন্যতায় ভরে রইল।

এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর ?

মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার-গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

এই কৈশোর-বয়সেই কবি বুঝেছেন—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন

'কবি-কাহিনীর' নায়ক কবি যখন শূন্যমনে বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন তখন তিনি কাছে পেলেন একটি বালিকাকে। এতদিনকার সঞ্চিত বাণী ও বেদনা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তিনি বালিকার কাছে প্রেম নিবেদন করে হৃদয় জুড়ালেন। কিন্তু এত সুখেও কেন মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল না! এ যেন সেই চিরন্তন বেদনার কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

৪

'কবি-কাহিনী'তে যে অস্পষ্ট ভাবোচ্ছ্বাস দেখি, 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তেমনি অস্পষ্টই রয়েছে। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য গঠনের সময় কবির মনের যে অবস্থা ছিল সেই প্রসঙ্গে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

"···মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল বাষ্প আছে—বাষ্পভরা বুদ্‌বুদ্‌-রাশি, সেই আবেগের কোমলতা অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোন রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ, উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভেতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ।"

কবির এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কবি-কাব্যতীর্থে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া পাঠকদের পক্ষে একটু সুবিধাজনক হয়েছে বলে মনে হয়।

৫

'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'-এর পর আমরা 'শৈশব-সঙ্গীত'-এর স্রোতোধারার মুখে এসে পড়ি। কিন্তু এখানেও সেই "বিবাগিনী রাগিণী কে গায়"। যে ব্যথা-বেদনা উচ্ছ্বাসে ভরপুর ছিল তা তেমনি রয়ে গেল। বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী একে কাটিয়ে ওঠা তখন সহজ ছিল না, তাই তার জের

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্যন্ত অগ্রসর হতে লাগল। 'শৈশব-সঙ্গীত' ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ সুর তাই প্রায় সমধর্মী। এই সব রচনা যতই উচ্ছ্বাসপ্রবণ চিন্তাবিহীন ভাববাহী হোক না কেন, তার একটা ঐতিহাসিক এবং কাব্যিক মূল্য আছে, তাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভাবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে ভাব ও চিন্তারাশি, আদর্শ ও প্রেরণা এইসব রচনায় অঙ্কুররূপে দেখা গিয়েছিল, পরবর্তী জীবনে সেইগুলিই বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

৬

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মূল সুর তীব্র বিষাদের সুরে বাঁধা। কিন্তু সে সুর নৈর্ব্যক্তিক নয়; জীবনধর্মের স্বাভাবিক বিচিত্র অনুভূতি মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যে বিষাদ-বেদনার সৃষ্টি হয় এতে সেইগুলিই মূর্ত হয়েছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিতাগুলির নামকরণেই তা প্রমাণিত হয। কেন এ বেদনার জন্ম এবং কিসেই বা তা উপশমিত হবে তা যেন কিছুতেই বোঝা যায় না। অশান্ত অবরুদ্ধ হৃদয়ের অকারণ ক্রন্দন বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পায না। তাই অতৃপ্তি ও নৈরাশ্য, বিষাদ ও বেদনা। কবির মনে হয জীবনে যদি কিছু পাওয়ার থাকে তবে সে একমাত্র দুঃখ, আর কিছু নয়; তাই "দুঃখ আহ্বান" কবিতায় কবি একান্ত বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে দুঃখকে আহ্বান করছেন—

আয় দুঃখ আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ,
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।

দুঃখই যেন মানুষের চরম এবং পরম প্রাপ্তি, এর জন্য ভয় পাবার যেন কিছু নেই, তাই কবি দুঃখভোগ করতেই চান—

বলো আশা, বসি মোর চিতে
আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।
করিয়ো না ভয়,
দুঃখ-জ্বালা আমারি কি নয়।

কবি যতই মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করুন না কেন, নিরবচ্ছিন্ন এই দুঃখের বোঝা কবি যেন আর বইতে পারেন না, তাই এই কাতরোক্তি—

বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ,
গাহিতেছে একই গান, একই গান, একই গান।

("হৃদয়ের গীতধ্বনি")

কবি এই দুঃখতাপ থেকে বেরিয়ে আসতে চান, একটু নির্জন একাকিত্বের যেন বড় প্রয়োজন, তাই 'সন্ধ্যা'র কাছে একটু সান্ত্বনা চান—

ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।
... ... ...
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

যৌবনের অব্যবস্থিত চিত্তবৃত্তি কখনও ভাবে, প্রকৃতির কাছে গেলে বুঝি সব দুঃখের নিষ্পত্তি হবে; আবার কখনও ভাবে, "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।"

হৃদয় একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাহি হায়।"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া,
"কেন সুখ, কার কর আশা।"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল,
"ভালবাসা, ভালবাসা গো।" ("সুখের বিলাপ")

কবি ভালবাসা লাভ করে হৃদয়কে তৃপ্ত করতে চাইলেন, কিন্তু যৌবনের কামনাক্ষুব্ধ এই প্রেমে তৃপ্তি পেলেন না। "বুকফাটা প্রাণফাটা মোর ভালবাসা, এত বুঝি ভাল নাহি লাগে"।

চাও তুমি দুখহীন প্রেম
ছুটে যথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী,
বহে যথা বসন্ত-বাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুঃখের নিশ্বাস। ("অসহ্য ভালবাসা")

দেহের দুয়ারে ·যে প্রেম ঘুরে মরে সেই প্রেমকে কবি "হলাহল" বলেছেন সেই প্রেমের কাছে এই প্রশ্ন—

প্রণয় অমৃত এ কি ? এ যে ঘোর হলাহল
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোণিত করেছে জল।
... ... ...
দূর করো দূর করো, বিকৃত এ ভালবাসা
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

পরাজিত হৃদয় নিয়ে কবি ভাবছেন, প্রকৃতি গেল, মানুষ. গেল, তবে "আর পাব কোথা"। তাই—

মনে হইতেছে আজি, জীবন হারায়ে গেছে
মরণ হারায়ে গেছে হায়,
কে জানে এ কি এ ভাব ? শূন্য পানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।
পরাজিত এ হৃদয়, জীবনের দুর্গ মম
মরণে করিল সমর্পণ,
তাই আজ জীবনে মরণ।

কবি "দুঃখকে আহ্বান" করেছেন, দুঃখই জীবনের একমাত্র প্রাপ্য, আর কিছু নয়—এই বোধেই দুঃখের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু শান্তিবিহীন, সান্ত্বনাবিহীন চিত্তে কবি আবার ভাবতে বসলেন, দুঃখ বেদনা নৈরাশ্যই জীবনের সবটুকু নয়। দুঃখের হলাহল পান করে জীবনকে শেষ করবার মধ্যে যাই থাক্ না কেন, তাতে মাধুর্য নেই মঙ্গল নেই। এই দুঃখবোধ জীবনের সুন্দরবোধকে, কল্যাণবোধকে যদি নিঃশেষে গ্রাস করে, শুধু আমার 'আমি'টাকেই বড করে দেখে, তবে তা প্রেমনাশা, প্রাণনাশা মৃত্যুবিভীষিকা হয়েই দেখা দেয়। এই বিষাদপূর্ণ মনোভাব মানুষের পক্ষে সুস্থও নয় স্বাভাবিকও নয়, বিকৃত মন ও মস্তিষ্কের পূর্বাভাষ মাত্র। তাই কবি দুঃখ-বন্ধনকে চরম স্বীকৃতি জানাতে পারলেন না। কবি বুঝেছেন এর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে না নিলে 'আমিত্বে'র গণ্ডীর মধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হবে, বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ থেকে চিরনির্বাসিত হতে হবে। তাই 'সংগ্রাম সঙ্গীতে" স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার জন্যে নিজের হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হতে চেয়েছেন।

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম
… … …
মিছা বসে রহিব না আর
চরাচর হারায়ে আমার
রাজাহারা ভিখারীর সাজে,
দগ্ধ ধ্বংস ভস্ম পরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি মাঝে ?
… … …
ফিরে নেব হারানো সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন ।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয় ।

'আমিহারা" কবিতায় কবি প্রথম জীবনের সেই সহজ সুন্দর "সুকুমার আমি"কে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল। জীবন-উষার রক্তিম প্রভাতে একদিন যাকে সহজ জীবনানন্দে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, তারপর জীবনের বক্র কুটিল পিছল পথে চলতে চলতে—

অবশেষে একদিন কেমনে কোথায় কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়
হারাইয়া গেল সে কোথায় ।

সহজ 'আমি'কে হারিয়ে কবি বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বের সঙ্গে কবির যে যোগ তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, অন্তরের সঙ্গে বাইরের যে মিলন এবং তা থেকে যে আনন্দ, তা থেকে কবি বঞ্চিত হয়েছেন, বিশ্বের সঙ্গে যোগে যুক্ত না হতে পারলে সে আনন্দমৃগয়ার মৃগের মত দূরেই ছুটে পালায়, তাকে পাওয়া সহজ-সাধ্য হয় না। কি যেন পেলাম না, কি যেন হারিয়েছি—এই বিষাদখিন্নতাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মূল সুর। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মূল সুর সম্বন্ধে লিখেছেন—"মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। . মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে।' বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গম্ভীর অন্তরালে যে মানুষটি বসিয়া আছে, তাহাকে ভাল করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি কিন্তু

জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সুর যখন মেলে না, সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোন বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে, তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশী। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে, সেখানে জীবন কোনমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাস অস্পষ্ট ভাষায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।"

মোহিতচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র এই ভাবের কবিতাগুলির সমষ্টিকে "হৃদয়ারণ্য" নামে অভিহিত করেছেন।

৭

এই আশাহীন "হৃদয়নাশা" বিষাদময় "হৃদযারণ্য" থেকে মুক্তি পাবার জন্য কবির ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। কোনদিন কোন একটি মাত্র ভাবের মধ্যে কবি অধিককাল আবদ্ধ থাকতে পারতেন না, তাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র শেষের দিকে "কোথা গো প্রভাত-রবিকর" বলে কবি যেন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তারপর সেই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির দিনটি এল। কবি আনন্দের সঙ্গে গাইলেন—"আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর।" এই ভাবে 'প্রভাতসঙ্গীতে' প্রভাতের শুভ্র আলোকে "নিষ্ক্রমণ" হল বিশ্বের মাঝে।

'প্রভাতসঙ্গীতে' কবি নূতন জীবনে উত্তীর্ণ হলেন। বিশ্বকে প্রথম লাভ করলেন বটে কিন্তু পিছনে-ফেলে-আসা তপ্ত নিঃশ্বাসের দিনগুলিকে একেবারে বিস্মৃত হতে পারলেন না। থেকে থেকে পিছনের ছায়া যেন সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াতে লাগল। তাই "আহ্বান সঙ্গীতে"ও আমরা দেখি—

নিজের বিশ্বাসে কুয়াসা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।

নিজের চারিদিকে কবি যেন রুদ্ধ কারাগার সৃষ্টি করে আছেন। রোদন, রোদন, কেবলি রোদন, কেবলি বিষাদ-শ্বাস। এই বিষাদ-শ্বাসে কবির অন্তরাত্মা অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সহজ রূপ-রস-আনন্দ পাবার জন্য কবি তৃষিত কাঙাল, অথচ কোথায় শান্তি, কোথায় তৃপ্তি। অবরুদ্ধ মনকে বোঝাতে বসলেন—

আজিকে বারেক ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়—
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেন রে শুকায়ে যায়।
... ... ...
মুদিত নয়ান পরান বিভল
স্তব্ধ হইয়া শুনিবি কেবল
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগৎ অতীত গান—
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে মগন প্রাণ।"

ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে "জগৎ বাহিরে যমুনা পুলিনে কে যেন বাজায় বাঁশি"—শ্রীরাধার মত কবিরও "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মন প্রাণ।" ঘর-ছাড়ানো প্রতীক্ষার এই বাঁশি একবার যে শুনেছে তাকে যে অভিসারে ছুটতেই হবে। তাই কবি সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য নিজের বন্ধনে আবদ্ধ ক্রন্দনাতুর হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন—

তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস।
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুখের শ্বাস।
ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত—
আর কত দিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়—
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,
বাহির হইয়া আয়।

এই আহ্বান সার্থক হল: স্বপ্ন থেকে জাগরণ আর মোহ থেকে মুক্তি হল।

নিজের গড়া রুদ্ধ কারাগারের কঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন করে কবি নবজীবনের সিংহদ্বারে পদার্পণ করলেন।

এই বিরাট পরিবর্তন কবির জীবনে খাতার একটি পাতা উলটিয়ে দিল। তারপর নূতন পাতায় নূতন জীবনের স্বাদ লাভ।

৮

এই মানসিক পরিবর্তনের কথা কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে (ফ্রী স্কুলের বাগানের দিকে) চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটি পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটি বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।...শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম,···বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটিকে যেন দেখিতে পাইলাম।" শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থে জানতে পাই—'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে কবি লিখেছেন—"একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"

রবীন্দ্র-কাব্যের ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্র-কাব্যে এমন কতকগুলি রচনা আছে যেগুলি কবি-জীবনের এক-একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। সেই জাতীয় কবিতার মধ্যে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" একটি। এর প্রত্যেকটি শব্দ ও ভাব অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। কবির পূর্বজীবন ও পরবর্তী জীবনের মানসিক পরিবর্তনের সুন্দর অভিব্যক্তি হয়েছে এই কবিতায়।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বাষ্পায় ভাবোচ্ছ্বাস, বস্তুহীন কল্পনা, কারণহীন কাজ এসব

থেকে কবি নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন। উচ্ছ্বাসপ্রবণতা আছে কিন্তু কল্পনার অজস্রতায়, অনুভূতির আন্তরিকতায় ও তীব্রতায়, ভাষা ও ছন্দের গতিশীলতায় কবিতাগুলি অনবদ্য হয়েছে।

'প্রভাতসঙ্গীতে' কবির আত্মবিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। "পুনর্মিলন" কবিতাটিতে এর সুন্দর অভিব্যক্তি দেখা যায়। এখানে কবি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র পূর্বে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র সময় এবং পরে এই তিনটি স্তরের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন—

সেই, সেই ছেলেবেলা
আনন্দে করে'ছি খেলা
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তারপর কী যে হল কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
... ... ...
কাটালেম কত শত দিন
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন—

তারপর "হৃদয়ারণ্য" থেকে হল নিষ্ক্রমণ।

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে।
আনন্দের সমুদ্রতীরে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার পূর্ব থেকে 'প্রভাতসঙ্গীত' পর্যন্ত কবিমানসের ধারা সম্বন্ধে কবি নিজেই তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।...তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবী করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটি ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইয়াছিলাম, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতার পরিচয় পাইলাম। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটি পালা শেষ হইয়া গেল।"

৯

'প্রভাতসঙ্গীতে' এসে কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন। মনে হল যাকে হারিয়েছিলেন তাকে পুনর্বার লাভ করলেন, কবির দুঃখ-বেদনা বুঝি দূর হল। কিন্তু সীমাহীন অন্বেষণ যাকে চিরপথিক করে রেখেছে তার শান্তি কোথায়? চিরদিনই সে বেদনাতুর। "তোমারে কোথায় পাব, তাই এ ক্রন্দন"—এ ক্রন্দনের শেষ সে চায়ও না। তাই 'প্রভাত-সঙ্গীতে' বিশ্বপ্রকৃতি, মানবপ্রকৃতিকে কাছে পেয়েও সন্দেহ-দোলায় মন দোলায়মান, এখানেও কবির প্রাণ "হু-হু করে","তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই"—

বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি
চিরকাল চিরকাল—তুই কি রে চিরকাল
সেই দূরে রবি।
... ... ...
আঁখি যেন কার তরে পথ-পানে চেয়ে আছে
দিন গনি গনি,
আমরণ চিরদিন কেবলি খুঁজিব তোরে
কখনো কি পাব না সন্ধান। ("প্রতিধ্বনি")

'প্রভাতসঙ্গীতে'র মধ্যে "প্রতিধ্বনি" কবিতাটি বেশ তাৎপর্যময় বলা যায়। এর মধ্যে কবিপ্রতিভা-বিকাশের কয়েকটি মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' উচ্ছ্বাসপ্রবণতা যথেষ্ট থাকলেও উল্লিখিত কারণের জন্য এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

'প্রভাতসঙ্গীতে' কবির বিশ্বৈক্যানুভূতি, সমগ্র বিশ্বে আনন্দময় সত্তার অনুভূতি, সীমা ও অসীমের মিলনসাধনের পালা, অপার্থিব সৌন্দর্যানুভূতি,

অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের অনুভূতি, সৃষ্টির নিত্যত্ব-বোধ—ইত্যাদি কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি ইঙ্গিত এতে খুব সুস্পষ্ট। 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনা সম্বন্ধে কবি নানা জায়গায় নানা কথাই বলেছেন, বিশেষ করে 'জীবনস্মৃতি' থেকে আমরা অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পারি। 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে পরবর্তী জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন—"......এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটি পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটি একই।"

'প্রভাতসঙ্গীতে'র শেষ কবিতাটি লক্ষ্য করবার মত। কবি 'প্রভাতসঙ্গীত' "সমাপন" করলেন এই বলে—

আজ আমি কথা কহিব না
আর আমি গান গাহিব না—

মন যখন পূর্ণতার স্বাদ পায় তখন এক অপূর্ব অপরূপ সত্যে ও মাধুর্যে প্রাণ-মন ভরে ওঠে, পার্থিব জীবনের কোন প্রভাব কোন দৈন্যই আর মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। চির প্রশান্তিতে মন ভরে যায়।

১০

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিষাদ-নৈরাশ্য কাটিয়ে 'প্রভাতসঙ্গীতে' মুক্তি লাভ করে কবি এক অপূর্ব আনন্দের অধিকারী হলেন, তারই জের চলল 'ছবি ও গানে'। এখানে এসে কবি নির্দ্বন্দ্ব মনে জগৎকে ছবির মত দেখতে লাগলেন। কিন্তু এর পরেও আবার 'কিন্তু' এসে পড়ে কেন? 'প্রভাতসঙ্গীতে' যে অন্তরবাহী বেদনা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, 'ছবি ও গানে'র হাল্কা ভাবে দেখা, ছবির মত দেখা জীবনেও কি সত্যিকারের কোন দুঃখ-বেদনা ছিল না? কবি কি সত্যই দুঃখকে জয় করতে পেরেছেন? এত আনন্দের মাঝেও কেন ফেলে-আসা দিনগুলির কথা কবির স্মরণ-পথে এসে মনটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে? কেন মনে হয়—

**কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারিপাশে**
**কত লোক কত সুখে দুখে,**
**সবাই তো ভুলে আছে— কেহ হাসে কেহ নাচে,**
**তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!**

বাতাস যেতেছে বহি, তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস !
সুদূরে বাজিছে বাঁশি তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস !

( "পুরাতন", 'কড়ি ও কোমল' ,

কবি নূতনকে আহ্বান করে মনকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট. কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন সংশয়ের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে এই আনন্দের দিনগুলি বুঝি ক্ষণস্থায়ী। "বাঁশরি বাজাতে চাই বাঁশরি বাজিল কই ?" তাই থেকে থেকে "যোগিয়া রাগিণী গায় কে রে।"

বিষাদকাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার,
কোনখানে তাহার ভবন,
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
এ কি রে আকুল ভাষা ! প্রাণের নিরাশা আশা
পল্লবের মর্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
... ... ...
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়,
কাছে আসে বসে পাশে তবুও কথা না ভাষে,
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়—
চায় তবু নাহি পায় অবশেষে নাহি চায়—
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান। ( "যোগিয়া", 'কড়ি ও কোমল' )

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে অনাবিল সৌন্দর্য-সন্দর্শনেও মন ভরে উঠল না, তাই 'কড়ি ও কোমলে' কবির মন সমস্ত স্বপ্নকুহেলিকা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতি ও মানবকে বিচিত্র দর্শনে দেখতে চাইল। প্রকৃতি ও মানবকে সমগ্ররূপে না পাওয়ার অতৃপ্তি এই কবিতাগুলির মূল সুর।

'কড়ি ও কোমলে' বিচিত্র ধরনের কবিতা আছে। কোথাও সুখের গীতি, কোথাও বেদনার। কিন্তু সুখের মধ্যেও বিষাদের ছায়াপাত হয়েছে। মনের এ অবস্থাও কবির ভাল লাগছে না, শেষ করে দিতে চাইছেন "শেষ কথা" বলে।

কবি উপলব্ধি করেছেন, ক্ষণিকের সুখ-সম্ভোগে যে আনন্দ তা ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন। তাতে জীবন নাশ হয়, আত্মতৃপ্তি ঘটে না। তাই তিনি এই সীমাবদ্ধ জীবনে "অসীম সুন্দরকে" পাবার আকাঙ্ক্ষা করলেন। কবি বুঝলেন, সীমার মধ্যে "শেষ কথা" বলা যায় না, কারণ "শেষ নাই যে শেষ কথা কে বলবে ?" কাজেই শেষ কথা শোনাতে হবে অসীমের কানে।

১১

এই অসীমের সন্ধান শুরু হল নূতন পথে। এ পথে যে দুঃখ-বেদনার সঞ্চার হল তা পূর্ববর্তী দুঃখ-বেদনার মত ভাবালুতাময় নয়। এ দুঃখ কঠিন তপস্যার আগুনে নিকষিত হেম। তার প্রকাশ আমরা দেখি 'মানসী' কাব্যে।

'মানসী'র প্রথম কয়েকটি কবিতা বেদনার কবিতা। এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হয়েছে কেন, তার ব্যাখ্যা কবি আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক পরে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—"কবি-চিত্তের দুইটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায়ে সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করে বলতে চায়, সেই বলার জন্যে তার মন অস্থির হয়ে পড়ে। এই যে তার বেদনা-প্রকাশের ব্যাকুলতা, এটা তাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। তার জীবনের আর একটা দিকও আছে, সে অধ্যায়ে সে বেদনার উৎস হতে প্রাপ্ত ভাবকে জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই যে সৃষ্টির আবেগ, এটা তাকে এমন একটা রসোপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায় যেটা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়, বেদনাও নয়, তা হচ্ছে দুঃখ-বেদনার অতীত এমন একটা বস্তু যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে চিরন্তনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়। কবি তাঁর কাব্যে, রচনায়, জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডির থেকে পার করে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাঁকে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।"

'কড়ি ও কোমলে' সম্ভোগ এবং সেই সম্ভোগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তা থেকে মুক্ত হবার জন্যে ব্যাকুলতার প্রকাশ হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব 'মানসী'র প্রেমের কবিতার বিষয়বস্তু। 'কড়ি ও কোমলে' যে প্রেমের ঘোরে বাহুলতা একজনকে অবলম্বন করতে চাইত, 'মানসী'তে সেই প্রেমের ভুল যেন ভেঙে যাচ্ছে। প্রেমের মধ্যে একটি "নিষ্ফল কামনা" যেন কবিকে

অনবরত পীড়িত করে তুলেছে। মানুষের প্রেমের মধ্যে কবি বাঁচতে চেয়েছিলেন, "জীবন্ত মানব মাঝে বাঁচিবারে চাই"—এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সে যে দুরাশা, বৃথা এ ক্রন্দন, তা কবি প্রতিদিনই বুঝতে পারছেন এবং তাতেই তাঁর হৃদয় ক্রমশই বিষাদে ভরপূর হয়ে উঠছে। কারণ যে প্রেম কামনাদগ্ধ তাতে নিত্যকালের কোন প্রাপ্তি নেই, আছে শুধু অবসাদ ও গ্লানি। তাই কবি চান—

যে প্রেমেতে এত ভয়, এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও।

'মানসী' কাব্যে কবি যে শুধু প্রেমের বেদনাই ভোগ করেছেন তা নয়, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করেও কবির মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। তা ছাড়া কবির বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিদ্রূপ ও নিন্দা প্রচারিত হয়েছিল তার জন্যও কবি কম দুঃখ ও অপমান বোধ করেন নি। সুদুর্লভ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেও কবি এই আঘাত ভুলতে পারেন নি। 'আত্ম-পরিচয়ে' কবি লিখেছেন, "এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি।"

'মানসী'-পর্বে দুঃখবাদ সমস্ত কবিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এমন কি এই যুগের নাটকও এই বেদনা থেকে অব্যাহতি পায় নি। তবুও একটা জিনিস 'মানসী'র কয়েকটি কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে, যা পরবর্তী জীবনের ভাব-ধারার সূচনা করে। এই বেদনা-বোধ, দুঃখ-বোধের মধ্যেও কবি যেন কোথা থেকে কী একটা অব্যক্ত অবোধ্য আনন্দ লাভ করছেন। যাকে কবি না বুঝেও চেয়ে আসছেন, তাকে যেন পেয়েছেন অথবা পাবার আভাস পাচ্ছেন। তাই ধ্যান-নেত্রে তিনি দেখছেন—"যত দূর হেরি দিগ্‌দিগন্ত তুমি আমি একাকার।" কবি চির-আকাঙ্ক্ষিত মানসী-প্রিয়াকে যেন কাছে পেলেন এবং বুঝলেন, এতদিন তোমাকেই বুঝি চেয়ে আসছিলাম, "তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"

এই শান্ত মনোভাব কবির চঞ্চল মনে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না, আবার আকাঙ্ক্ষা জাগল।

'মানসী'তে দেখা যায় কবির মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে, কী যেন চাইছেন অথচ পাচ্ছেন না, অন্তরের সঙ্গে বাইরের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, পারিপার্শ্বিক-

তার সঙ্গে নিজের যেন কোনমতেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে উঠতে পারছেন না। "তাঁহার চঞ্চল মন কোথাও যেন তৃপ্তি পাইতেছে না। কিসের শ্রান্তি, কিসের ক্লান্তি, কিসের বিষাদ বাহির হইতে আবিষ্কার করা যায় না।...হৃদয়ের যত আশা যত অন্ধকার কাঁদিয়া বেড়ায়" ('রবীন্দ্র-জীবনী')। "উচ্ছৃঙ্খল" কবিতায় কবি আকুলভাবে বলছেন—

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন প্রলাপবচন সম।
জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ, অনিয়ম শুধু আমি।

"আগন্তক" কবিতাটির মধ্যেও এই অভিযোগ, অভিমান—

কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিয়া গাহিয়া
অজানা আঁধার সাগর বাহিয়া মিশায়ে যাইবে কোথা।

কার জন্যে কবির এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া সৃষ্টি-ছাড়া ব্যথা? কবি বলছেন—

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চির দিবসের
চির মনোব্যাকুলতা। ("উচ্ছৃঙ্খল")

সব কবিতার মধ্যে সেই একই বেদনা, সেই একই অভিযোগ যে, তিনি সঙ্গীহারা কাকে যেন চান অথচ পান না, কাকে যেন সবটুকু দিতে চান অথচ নেবার কেউ নেই। এই বেদনার কোন রূপ নেই, কোন সীমা নেই; অন্তবিহীন এ বেদনা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে লিখেছেন—"এই সময়ে তাঁহার তরুণ বন্ধু প্রমথ চৌধুরী তাঁহাকে এক পত্রে জানান যে 'মানসী' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে despair ও resignation-এর ভাবটাই প্রবল হইয়া ফুটিয়াছে। সেই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা লেখেন তাহা 'মানসী'র একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা হিসাবে পঠনীয়: 'মানসী' সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা despair এবং resignation-এর ভাব আছে প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্ছি, নিজের রচনা এবং নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই despair এবং resignation-এর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। 'কড়ি ও কোমলে'র সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের

প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল, হতেও পারে। আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলচে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না, আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে সেই জন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্যে সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"[১]

## ১২

এই নিষ্ফলতার বেদনা এবং তার জন্য মানসিক চাঞ্চল্য যা আমরা 'মানসীতে' দেখি তা 'সোনার তরী'তে এসে অনেক পরিণত ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এতদিন যে অনুভূতি, যে বাসনা কল্পলোকের সামগ্রী হয়ে ছিল, তা এখন জীবনলোকের আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেল। প্রকৃতি, মানুষ সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় গভীর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। বিশ্বের রূপ-জগতের যে তরঙ্গ প্রতিনিয়তই উত্থিত হচ্ছে তার প্রবাহ কবির মনকে স্পর্শ করেছে। এতদিন কল্পনার উচ্ছ্বাসে বাস্তবের সত্য ও সুন্দর রূপ কবির কাছে কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাই আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কবির মন আন্দোলিত হয়েছে, কিন্তু এই পর্বে কবির ভাবজীবনের বিবিধ প্রশ্নের সমাধান হয়েছে। বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যে কবি যে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান করছিলেন তার সাক্ষাৎ লাভ করলেন। 'মানসী'তে সৌন্দর্য প্রেম নিসর্গ সবই কবি ভোগ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে চির-সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের স্পর্শ পান নি। তাই 'মানসী' কাব্যের মধ্যে আমরা দেখি কেবলই হা-হুতাশ ও নৈরাশ্য-বেদনা। 'সোনার তরী'তে এই সত্য উপলব্ধ হল যে, বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যেই সেই অনন্তের, সেই চিরন্তনের নিত্যলীলা। জীবনের মধ্যেই জীবনেশ্বরের প্রকাশ—অন্যত্র নয়। বাস্তবকে অস্বীকার করে কাল্পনিক আদর্শ-লোকে চরম সম্পদ অন্বেষণ করতে গিয়ে ক্ষ্যাপার জীবন যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, সেই রকম ব্যর্থতাকেই টেনে আনা হয়। এই সত্য উপলব্ধি 'সোনার তরী' পর্বেই হয়।

রূপের মধ্যেই লুকিয়ে থাকেন অরূপ-রতন, জীবনের কোন্ সুদুর্লভ মুহূর্তে সেই সোনা-করা ক্ষণটি এসে যায় সংস্কারে আবদ্ধ মানুষ তা টেরই পায় না। "কত মুহূর্তের 'পরে" 'পরে" সে তার "চিহ্ন লিখে যায়"—মোহান্ধ মানুষ তা দেখতে পায় না, অথচ হা-হুতাশ করে বেড়ায় "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।" "বিশ্বনৃত্য" কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে, মহাকাল ঊর্ধ্ব আকাশে বসে তাঁর বিষাণ বাজাচ্ছেন, সেই বিষাণের উদাত্ত ধ্বনি শ্রবণে বিশ্বচরাচর নৃত্যশীল, কিন্তু সংসারের আবিলতায় জড়িত মানুষ কেন সেই সুর শুনে আনন্দে নৃত্য করতে পারে না, কেন তার প্রাণের স্পন্দন জাগে না? কবি সব সংস্কার সব মায়ামোহবন্ধনপাশ কাটিয়ে বিশ্বের এই আনন্দনৃত্যে যোগ দেবার জন্যে ব্যাকুল। কবি বলেছেন, "বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।"

এতকাল কবি সৌন্দর্য সম্ভোগ করে এসেছেন বটে কিন্তু কবি ভোলেন নি যে, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য-রসের সম্ভোগের মধ্যে যতই মাধুর্য থাক্ না কেন তাতে আসে অবসাদ, চেতনার প্রদীপ্ত সার্থকতা আসে না। এখন থেকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল। কশা আঘাতে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার দিন এল। তবে কোথায় কোন্ দিকে খুলে যাবে চেতনার এই দ্বার তাই 'সোনার তরী'তে কবিতার এই প্রশ্ন—'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?" দূরতর চিরন্তন সুন্দর সত্যের আদর্শের জন্য কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তাই 'চিত্রা' কাব্যেও এই ব্যথিত সুরের মূর্ছনা এসে পড়েছে—নীরব সন্ধ্যায় কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছে—

নিঃসঙ্গিনা ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্য পানে—'আরো কোথা? আরো কত দূর?'

১৩

'চিত্রা'য় "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির ভাবধর্ম সেই সময়কার মানসিক অবস্থা থেকে একটু স্বতন্ত্র বলা যেতে পারে। সৌন্দর্যের রসসম্ভোগের কবি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনাও কবির

স্পর্শালু চিত্তকে অধিকার করে বসেছে। পৃথিবীর দুঃখ দূর করবার জন্য কবি অন্তরের মধ্যে একটি তীব্র বেদনা বোধ করেছেন এবং তারই অভিব্যক্তি হয়েছে এই কবিতায়। "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে কবি এই কবিতাটি সম্বন্ধে বলেছেন, "যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই আশ্রয়কে শ্রেয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশীর সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ। মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।···বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে তো বাঁশীর ললিত সুরে নয়। · এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।

"এ আহ্বান অতি সত্য অতি নিষ্ঠুর, অতি কঠিন মর্মচ্ছেদী এ আহ্বান, তবুও এতে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্নজীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটি পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিমুগ্ধ মানবলোকে রুদ্র বেগে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।"

এতদিন কবি ক্ষ্যাপার মত জীবন অতিবাহিত করে এসেছেন, কিন্তু আজ জীবনের পরিপূর্ণতার বাণী, সার্থকতার আহ্বান যেন শুনতে পেলেন। এই অজানা অচেনা পথে শত বাধা বিঘ্ন দুঃখ আঘাত আছে ঠিকই, কিন্তু অনায়ত্তকে আয়ত্ত করতে হবে, অজানাকে জানতে হবে—এই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহে কবিচিত্ত আনন্দ-বেদনায় কাতর।

নাহি জানি তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে। ("অন্তর্যামী"—'চিত্রা')

ঈপ্সিততমের সঙ্গে মিলনের আনন্দেই কবির মনে নব নব সৃষ্টির বেদনা জাগছে। এই বেদনার মধ্যেই কবির দুঃসহ আনন্দ। কবি চান নিত্যনূতন রূপ ও ভাবের অভিব্যক্তিতে অন্তর্যামী তাঁর জীবন পূর্ণ করুন—

নব নব রূপে ওগো রূপময়,
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,

কাঁদাও আমারে ওগো নির্দয়
চঞ্চল প্রেম দিয়ে। (ঐ)

এ জীবনে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কবি যে দুঃখ বেদনা পেলেন তার জন্য কবি জীবনবিমুখ নন, পরন্তু তিনি চান পরজন্মেও যেন এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবন-দেবতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁর কথা হল এই—

এবারের মত ভরিয়া পরান
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান
যে সুরা তরল অগ্নি সমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি—
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি। (ঐ)

'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী'র যুগে যে বেদনাবোধ ছিল তার নিতান্তই বাস্তববাদী, তাই তাতে বিষাদ-সুরই শোনা যেত, আনন্দের সুর তেমন বাজত না; কিন্তু 'মানসী'র শেষ যুগ ও 'সোনার তরী'র পর্ব থেকে বেদনার স্বরূপ ক্রমশই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বেদনা নৈরাশ্যধর্মী নয়—আনন্দঘন, নিবিড় প্রত্যাশায় ভরপুর।

১৪

'চিত্রা' কাব্যে যে গভীর বেদনা রূপ লাভ করল, 'কল্পনা' কাব্যে এবং তার পরেও তার ব্যাপ্তি আমরা দেখতে পাই।

অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির শিল্পময় জীবন থেকে বিদায় নেবার কারণ সম্পর্কে বলেছেন—"আমার তো কবির পূর্ব-জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই দুইটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়—আর্টের জীবনে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি মিলিতেছিল না, এবং দুইটি বড় ত্যাগের ক্ষেত্রে আপনাকে উৎসর্গের দ্বারা জীবনকে বড় করিয়া পাইবার তৃষ্ণা জাগিতেছিল।" ('রবীন্দ্রনাথ')

সাময়িক পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংসারিক, জমিদারির কাজকর্ম নিয়ে এই সময়ে কবি মনের দিক থেকে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বছরের শেষ দিনটির দিকে চেয়ে কবির মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হয়েছিল এবং এই ভাবগুলি পরবর্তী জীবনে একটির পর একটি সোপান তৈরী হয়ে ওঠবার পক্ষে খুব কার্যকর হয়েছিল। কবি লিখেছেন—"এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল, যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ

তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে···সেই ডাক দিয়ে গেল।" "অভ্যস্ত কর্মে দিন যায়, চিত্ত প্রসন্ন হয় না।"

লাভ ক্ষতি—টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ,

কলহ সংশয়—

সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি

দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

"ঝড় ক্রমে আমার মনের ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে···এখন থেকে দ্বন্দ্ব দুঃখ বিপ্লবের আলোড়ন।" নিরবচ্ছিন্ন শিল্পীর মাধুর্যময় জীবন থেকে কবি মানুষের শাশ্বত সত্যস্বরূপের দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছেন। মহত্তর, বৃহত্তর জীবনের পথে অনেক ত্যাগের সাধনা প্রয়োজন, দুঃখ-বেদনার পথে এ অভিসার।

'কল্পনা'র যুগে কবি দুঃসহ বেদনার বাধা নিয়ে সেই কঠিন পথে অগ্রসর হয়েছেন। "যে আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায় তাকে ও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়।" তাই আমরা দেখি 'কল্পনা'র কবির মন অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়িত। এতদিন যে রসসম্ভোগের জীবন ভোগ করে এসেছেন তাকে ছাড়ব বললেই তো ছাড়া যায় না আবার যে জীবনটাকে জানি না সেই জীবনে পদার্পণ করতেও অজানা আশঙ্কায় মন ভরে ওঠে। এই দুই বেদনার দ্বন্দ্ব 'কল্পনা' কাব্যে অনেক কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি বুঝেছেন, এ জীবন কুসুম-পেলব, শান্ত-সমাহিত নয়, এখন বড় দুঃসময়, এখন "সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে", এখন "সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া", এখন "অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে,···ফেনহিল্লোলে কলকল্লোলে দুলিছে," এখন "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।" পূর্বজীবনের শিল্পময়, মাধুর্যময় দিনের কথা কবি ভুলতে পারছেন না, তাকে ছেড়ে আসতে অন্তর বেদনাদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অমোঘ যে ডাক সে ডাকে তো সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।

অজিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"সত্যই সন্ধ্যা আসিয়াছে—'চিত্রা' 'সোনার তরী'র জীবনের কাছে বিদায়। এখন নূতন জীবনের যাত্রায় পক্ষবিস্তার করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্ পথে কোন্ ভাবলোকে যে নূতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোন ঠিকানা নাই।···বাস্তবিক বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে 'কল্পনা'য় বার বার পিছন ফিরিয়া গত জীবনের প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে।"

পিছনের ফেলে-আসা দিনগুলির প্রতি আকর্ষণ আছে, ভবিষ্যতের ভয়ও

আছে, কিন্তু যিনি অলক্ষ্যে থেকে সবই নিয়ন্ত্রিত করছেন তাঁর আহ্বান সমস্ত ভয়-সঙ্কোচ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, সমস্ত বিফলতার মধ্য দিয়ে কবিকে চরম সার্থকতার অভিমুখে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। কবিও পরম বিশ্বাসে এই নূতন জীবনের কঠিন কর্তব্যভার গ্রহণ করে অগ্রসর হতে চাইলেন। কবি জীবনের সমস্ত ভোগতৃষ্ণা গ্লানি আনন্দ বিষাদ দূর করে মহাজীবন লাভের দুঃসহ বেদনার পথে যাত্রা শুরু করলেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী আরও বলেছেন—"দুঃখ সুখ, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাখিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য সমস্ত 'কল্পনা'র কবিতাগুলির মধ্যে কি কান্না!" আপনার মধ্য থেকে মুক্তি পেতে হবে, রসমাধুর্যময় গত জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে কবি বুঝেছেন, কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনা থেকে এত সহজেই তো মুক্তি পাওয়া যায় না, এবং এই ব্যথাটিও কম তীব্র নয়। 'কল্পনা' কাব্যে যে জীবনের আরম্ভ, 'নৈবেদ্য' কাব্যে তার কিছুটা পরিণতি হয়েছে বলা চলে। 'নৈবেদ্যে'র জীবন আরও ধ্যানগম্ভীর। 'কল্পনা' কাব্যে বৃহত্তর জীবন লাভের জন্য যে কাকুতি শোনা গিয়েছে, 'নৈবেদ্য' কাব্যে তা অনেকটা আত্মসমাহিত ভাব ধারণ করেছে।

১৫

কিন্তু 'কল্পনা'র জীবন থেকে 'নৈবেদ্যে'র জীবনে উত্তীর্ণ হবার মাঝপথে কবি নিজেকে একটু হাল্কা করে নিতে চাইলেন 'ক্ষণিকা'য়। 'ক্ষণিকা'র আপাত-চটুলতা আমাদের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। 'কল্পনা'র পরেই 'ক্ষণিকা'কে ক্ষণিকের জন্য পাবার উদ্দেশ্যে আমরা যেন প্রস্তুত ছিলাম না।

'ক্ষণিকা'র মধ্যে এই চটুলতা ও কৌতুকবিলাস কেন, তা আমরা কিছু কিছু অনুমান করতে পারি। নিজের আজন্মপরিচিত পরিবেষ্টন ছেড়ে একটা বড় ত্যাগের জীবনের জন্য ভিতরে ভিতরে তিনি অত্যন্ত ব্যথা বোধ করছিলেন, এদিকে পুরাতন জীবনকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে তার জন্যও বেদনার অন্ত নেই—এই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সত্যিকারের কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি এই বেদনাকে কিছু লাঘব করবার জন্য, সুখ-দুঃখকে মিলিয়ে এক করে দেখবার জন্য হাস্য-কৌতুক-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে হৃদয়-বেদনাকে গোপন করতে চাইলেন। "বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।" "গভীর সুরে গভীর কথা" বলবার সাহস নেই, তাই—

ঠাট্টা করে ওড়াই সখী
নিজের কথাটাই,
হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।

* * *

উলটা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই। ("ভীরুতা", 'ক্ষণিকা')

যাই হোক, 'ক্ষণিকা'তে এসে কবি একটু হাল্কা হতে চেয়েছিলেন, বুকের বোঝাকে একটু নামাতে চেষ্টা করেছিলেন, জগৎ ও জীবনকে সহজ ভাবে, সহজ আনন্দে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হল না, হতে পারেও না। কারণ "কাব্যের উৎস পরম বেদনার গুহামধ্যে, যাহাকে হাসিব ছটার দ্বারা বাহিরে প্রকাশচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে যে 'আঁখির জল' জমিয়াছিল।" তাই 'সমাপ্তি'তে কবি বলছেন—

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা।
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা!

'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'তে পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আগামী জীবনের বিচ্ছেদ-বেদনার কথাপ্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—"মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নাড়ী-কাটার যে বেদনা শিশু পায়, পূর্ব-জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই প্রকারের বেদনা এই কাব্যগুলির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।... 'কল্পনা'র কারুখচিত প্রাচীন কালের সৌন্দর্যের সুনিপুণ রচনার নীচে এবং 'ক্ষণিকা'র কৌতুকহাস্যোজ্জ্বল তরল সৌন্দর্যপ্রবাহের তলায় যে পূর্ব-জীবনের, আর্টের জীবনের একটি সমাধি তৈরি হইয়াছে, সে খবর ঐ দুই কাব্যের ভিতর হইতে কে পড়িতে পারে? ঐ দুই কাব্য-বেদনার মেঘ অতি নিবিড় বলিয়াই অলংকারের রশ্মিচ্ছটা অমন আশ্চর্য-ভাবে বিচ্ছুরিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।"

জীবনের দীর্ঘ চক্রপথে কবি যাকে অশ্রু-সজল নেত্রে অক্লান্তভাবে অন্বেষণ করে ফিরেছেন, আজ কি তাঁর দেখা মিলল?

সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা—

এখন নির্জন সন্ধ্যাদীপালোকে 'তুমি আর আমি'র জীবন আরম্ভ হল। কবির জীবনের সে চঞ্চলতা আর নেই, সে হুহু-করা প্রাণও আর নেই, বিরাটের জন্য 'নৈবেদ্য' আয়োজন শুরু হল।

১৬

'নৈবেদ্য' কাব্যে এসে কবিচিত্ত শান্ত সমাহিত, পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ লাভ করেছে। এখানে 'প্রভুর চরণে' জীবন সমর্পণের পালা শুরু হয়েছে। এখানে কবির একান্ত প্রার্থনার আকুলতা উপলব্ধি করা যায়। কবি জীবন সমর্পণ করেছেন, সেই সমর্পণে যে গুরু-দায়িত্ব এসে পড়েছে তার জন্যও প্রস্তুত হয়েছেন, তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

আমি চাই ওগো ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি। ('নৈবেদ্য')

আরও বলেছেন—

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
... ... ...
বীর্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ('নৈবেদ্য')

১৭

'স্মরণ' কাব্যখানিকে অনেকে শোক-কাব্য বলে মনে করেন। কিন্তু শোক-কাব্য বলতে যা বোঝায় 'স্মরণ' কাব্যখানিকে ঠিক সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। স্ত্রীর মৃত্যুতে কবি হৃদয়ে যে বেদনা পান সেই বেদনার প্রকাশ হয়েছে এই কাব্যে। কয়েকটি কবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিগত শোক-দুঃখকে অতিক্রম করে বিরাট সত্যানুভূতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছেন, মৃত্যু কিংবা বিচ্ছেদ-বেদনা, শোক, দুঃখ এদের কোন স্থায়ী রূপ নেই। বিশ্বজগতে যেখানে যা কিছু

আছে সবই অনন্ত ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। অনন্ত ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কাজেই এই আনন্দ থেকেই যখন জন্ম এবং এই আনন্দেই যখন বিশ্রাম তখন শোকের স্থান কোথায়? এইভাবে তিনি দুঃখ-বেদনাকে ভাবের বৃহৎ ভূমিকায় দেখেছিলেন।

১৮

'খেয়া' কাব্যে আবার সেই পারিজীবনের বিক্ষিপ্ততা এবং মৃত্যু শোক দুঃখ বেদনাবোধ সবই যেন কবিমনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এতে কবি বিহ্বল হয়ে পড়েননি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য এর মূল সুরও নয়। 'নৈবেদ্য' কাব্যে নিজেকে নিবেদন করা পৌঁছেই গিয়েছে, এবার পরমধনকে আরও নিবিড় করে পাবার জন্য কবি সবপেক্ষা প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ 'খেয়া'র কোন কোন কবিতার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'খেয়া'তে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে। তিনি যে অশান্তি। মানুষ মোহবশতঃ ভুলে থাকে, নিশ্চেষ্ট থাকে, তাই সেই জড়ত্ব চৈতন্যকে জাগ্রত করবার জন্যে রুদ্ররূপে "দুঃখরাতের রাজা"রূপে তাকে একদিন না একদিন আসতেই হবে। দ্বার ভেঙে রাজার আবির্ভাব হবেই। এই 'খেয়া'তে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম?

এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারী।
এ যে তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি তো বন্ধন, যদি তাকে অশান্তির ভিতর থেকে না পাওয়া যায়?

আজকে হতে জগৎ-মাঝে ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
... ... ... ...
তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধনক্ষয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

'খেয়া'তে এবং পরবর্তী যুগে এমন বহু কবিতা আছে যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, দুঃখের সমাপ্তি যদি দুঃখতেই হত তবে মানুষের আর কোন আশ্রয় থাকত না। তাই 'বলাকা' কাব্যে কবি বলেছেন—

নিদারুণ দুঃখ-রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

"চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ।...এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে তো সত্য নয়।" তাই কবি কামনা করেন—

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে—
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান। ('গীতাঞ্জলি')

দুঃখ যে রুদ্র রূপে আসে তা ভীষণ, তা সুন্দর, তা চরম সত্য, পরম প্রিয় তার প্রেমে আঘাত আছে কিন্তু "নাইকো অবহেলা"।

১৯

তারপর 'গীতাঞ্জলি'তে পরম প্রিয়কে পাবার জন্য কী আকুতি, কী তীব্র আবেগ-বেদনা। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করবার জন্য কী ব্যাকুলতা। এই সাধনার বেদনা, ব্যর্থতার অস্পষ্ট ক্রন্দন 'গীতাঞ্জলি'কে অশ্রুসজল করে তুলেছে।

'গীতাঞ্জলি'র সাধন-বেদনের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"'খেয়া' গ্রন্থে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি উন্মুখ চিত্তের অধীর প্রতীক্ষা। 'গীতাঞ্জলি'তে সর্বত্রই এই উন্মুখ অধীর প্রতীক্ষা বিরহের ক্রন্দনে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত করে না পাওয়ার দুঃখ 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির উপরে সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে। নানা অবস্থায় নানা পরিবেশের মধ্যে কবি নানাভাবে দেবতার সান্নিধ্য লাভ করিতে চাহিয়াছেন, নানাভাবে কবি উঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, সত্যকার সম্পূর্ণ উপলব্ধি যেন এখনও হয় নাই, সেইজন্যই একটা ব্যথা ও বেদনা। সুর 'গীতাঞ্জলি'র অনেক গানেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দুঃখ-আঘাত-বিপদের ভিতর দিয়া যে সাধনা সে সাধনাকে কবি স্বীকার করিয়াছেন, এবং সে সাধনার ভিতর দিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইয়া দেবতার স্পর্শ তিনি চাহিয়াছেন; দুঃখ আঘাত বেদনা যে দেবতারই স্পর্শ এই উপলব্ধি

তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে।...'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ গানে তাই রসের কথা অপেক্ষা সাধনার কথা বড়, আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।"

('রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা')

দুঃখের আঘাত ভিন্ন জীবনের পূজা তাঁর দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না, তাই কবি বলেছেন "আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।" এই ব্যথার গানেই কবি তাঁর অঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

২০

'গীতিমাল্যে'র গানগুলিতে বেদনার সুর অপেক্ষাকৃত কম। কারণ কবি বুঝেছেন এই বেদনা অ-ধন্য হতে পারে না—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।

এতদিন কবির দুঃখ নিয়ে দিন কেটে গিয়েছে, "অশ্রু মুছে মুছে" বাষ্পরুদ্ধ চোখে দেখতে পাওয়া যায় নি কখন দুঃখ গেছে ঘুচে। তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। তাই—

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে,
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে,
দুঃখকে আজ কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে। ('গীতিমাল্য')

'গীতিমাল্যে'র কবিতাগুলিতে অনেকটা দুঃখ-মুক্তির আনন্দ লাভ করা যায়। কবির উপলব্ধি এখানে বেশ শান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও থেকে থেকে বেসুর বেজে ওঠে কেন? কে যেন কবিকে কাঁদায় এখনও, কবি তাঁর নাম জানতে পারলেন না; তাই যেন বেদনাভরা কণ্ঠে আবার বললেন—

এই বেদনার ধন কোথায়
ভাবি জনম ধরে।
ভুবন ভরে আছে যেন
পাইনে জীবন ভরে।

সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে 'চাই নে চাই নে'
বাজে অবিশ্রাম।

শুধু একমাত্র তাকেই কবি চান যাকে পেলে আর কোন চাহিদাই থাকে না। সেই ব্যাকুল প্রতীক্ষার দিনটি কবি চাইছেন—যেদিন সারা দেহ-মন মথিত করে হৃদয় 'নিঙাড়ি' এই কথাটি অশ্রু হয়ে ঝরে পড়বে—

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বলব আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে।
... ... ...
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়নজলে গলে। ('গীতিমাল্য')

প্রেমের নিবিড় বেদনা কবি যেন আর বইতে পারেন না, অথবা কথার রঙে রঙীন করে আর যেন তা বলতে পারেন না। কী এক অব্যক্ত আনন্দ-বেদনায় সারা অন্তরটা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমি যে আর সইতে পারি নে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো,
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।
হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি যে আর বইতে পারি নে। ('গীতালি')

এতদিনকার বেদনা যেন 'গীতালি'তে সার্থক হয়েছে, তাই এখানে বিশ্বাস দৃঢ়—শঙ্কা নেই, ব্যথা নেই, পরিপূর্ণ প্রেম ও বিশ্বাসে কবির মন ভরে গিয়েছে, আজ কবি অকুণ্ঠিত, নিঃশঙ্ক—

আজ তো আমি ভয় করি নে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে। ('গীতালি')

সারা জীবনের দুঃখসাধনার মধ্য দিয়ে কবি এই জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ

করলেন যে দুঃখ-বেদনার মধ্যেই পরম প্রিয় বস্তুটিকে পাওয়া সম্ভব, সুখের ললিতক্রোড়ে নয়।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভরা। (ঐ)

এই মিলন একদিনেই সম্ভব হয় নি, সারা জীবনের কত কান্না কত নৈরাশ্য কত অসহনীয় ব্যথার পর, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রিয়তম ধরা দিলেন।

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে অনেক দুখে নিলেম চিনে। (ঐ)

আত্মনিবেদনের পর তাঁকে জীবনে আমন্ত্রণ করে না নিলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সব সাধনার বেদনা। তাই—

হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়—
তোমারি হউক জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়। (ঐ)

২১

এর পর অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে 'বলাকা'র বিস্ময়কর আবির্ভাব। এ আবির্ভাবের জন্য কেউ বুঝি প্রস্তুত ছিল না। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র পরিপূর্ণ রসলোক ছেড়ে কবি যে আবার ধূলার ধরণীতে "কান্না হাসির দোল-দোলানো" ক্ষণস্থায়ী জীবনে ফিরে আসবেন তা কে ভাবতে পেরেছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে, কবি কোনদিন কোন নির্দিষ্ট পথে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারেন নি, কোন অবস্থাকেই তিনি কোনদিন চরম এবং পরম বলে গ্রহণ করেন নি। কবি চিরদিনই চঞ্চলের নিত্যসহচর। তাই 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র শান্ত গতিহীন আনন্দলোক তাঁকে বেশীদিন বেঁধে রাখতে পারল না।

'বলাকা'য় কবি তাঁর প্রিয়তমের সান্নিধ্য যেন আরও গভীর করে লাভ করলেন। দূরত্ব প্রেমকে আরও গভীর করে তুলল। নিবিড় প্রেমের পরশ পেয়ে বিশ্বজগতের তুচ্ছতম বস্তুটি পর্যন্ত সহনীয় হয়ে দেখা দিল। গভীর প্রেমের তুলিকায় আজ সবই রঞ্জিত।

২২

'পলাতকা'য় দেখা যায়, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, অতি-তুচ্ছ হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের মধ্যে তিনি তাঁর স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। দীর্ঘদিন পরে মাটির ধরণাতে ফিরে এসে সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুটুকুও অনুভূতিপ্রবণ আর স্পর্শালু কবিচিত্তের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় নি। পরন্তু যেন আরও নিবিড় করে তাদের উপলব্ধি করলেন। 'পলাতকা'র "শেষগানে" কবি জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্ত করলেন। তিনি ধুলা-মাটি, ফল-ফুল, প্রকৃতি-মানুষ, "যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো আপন হিয়ার পরশ দিয়ে" তাদের সঙ্গে "আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়" সাঁতার দিতে চেয়েছেন, এবং পরম স্বীকৃতি জানিয়েছেন যে "এই যে দেখা, এই যে ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো।"

২৩

'পলাতকা'র "শেষগান" দিয়ে 'পূরবী' রাগিণীর উদ্বোধন হল। চিরদিনই পৃথিবীর প্রতি কবির অচ্ছেদ্য ভালবাসার টান, কিন্তু তবুও এই জীবন থেকে কবিকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তারপর সুদীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে, আবার কেন সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে গেল? মাটির মা-টিকে কবি যে ভুলতে পারেন না—

বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে। ("মাটির ডাক", 'পূরবী')

আবার কবি নূতন করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন—

কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন। (ঐ)

এখানে কবি তাঁর প্রথম জন্মদিনের অম্লান তরুণ নবজাতককে আহ্বান করছেন—

হে নূতন
দেখা দিক্ আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
...  ...  ...
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।

জীবনের সায়াহ্ন-লগনে আবার কার "আগমনী" প্রাণকে যৌবনরসে উতলা করে তুলল? সে বুঝি—

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন হাওয়া বাহি। ('আগমনী', 'পূরবী')

'সোনার তরী' 'চিত্রা'র মানসসুন্দরী আবার বুঝি লীলা-বিলাস নিয়ে কবির কাছে কিঙ্কিণী বাজিয়ে পূর্ব-পরিচিত কণ্ঠে এসে ডাক দিল। এই অসময়ের সাক্ষাতে কবির মন অপূর্ব পুলক-বেদনায় ভরে উঠল। বহুদিনের ভুলে যাওয়া সুর আবার বুকের তলায় বেজে উঠল। আবার তাকে নতুন করে পাবার জন্য কবির যাত্রা হল শুরু। জীবন-সন্ধ্যায় তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ না করতে পারলে সবই যে ব্যর্থ হয়ে যায়! তাই—

এ-সন্ধ্যায় অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে। ('শেষ অর্ঘ্য')

কে সেই অভিসারিকা, যার জন্য কবি প্রতীক্ষারত? নিবে-আসা জীবনের দীপশিখার আলোকে আর কি তাকে চিনে নেওয়া যাবে? আর কি তাকে শেষ বারের মত "শেষ কথা" কবি শোনাতে পারবেন? তাই বুঝি হৃদয়-বেদনা দিয়ে সেই প্রহরটির জন্য তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন? আজন্মের সাধন-ধন সুন্দরী, চিরপ্রত্যাশিতা কোথায়, আর কত দূরে? ব্যাকুলতা-ভরা কণ্ঠে কবি বলছেন—

কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে? ('আহ্বান', 'পূরবী')

কিন্তু এ আহ্বান ব্যর্থ হয়ে যায়—

কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার ?
… … …
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।

নবজীবনের সূচনায় নূতন বেদনার জন্ম। পরম আনন্দের ক্ষণটিতেও মন যেন থেকে থেকে শিহরিত হয়ে ওঠে।

আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোল তলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
… … …
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস—
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।
… … …
যায় যাক, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন। …
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন। ("উৎসবের দিন")

সকল বন্ধন শেষ করে কবি স্বচ্ছ, মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করলেন, শেষ কিছুরই হয় না, ব্যর্থ কিছুই হয় না, অজানার পরপারে, অদৃশ্যের উপকূলে তারা পরিপূর্ণতায় সার্থক হয়ে ওঠে।

তোমার অরূপ তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফোটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে ওঠে,
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে। ("বৈতরণী")

২৪

'পূরবী'র শেষ রাগিণী সাতটি বছর পরে আবার বেজে উঠল। এই অধ্যায়টিতে যে কয়খানি কাব্য নাটক রচনা হয়েছে তার মধ্যে কবি-মানসের

বিশিষ্ট ধারাটি অব্যাহত ছিল না, ভিন্ন পথে এর রসাস্বাদন চলছিল। 'পরিশেষে' আমরা আবার সাতটি বছর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে এলাম। কিন্তু সে দিনের সেই জীবন-দর্শন থেকে এ জীবন-দর্শনের কিছু পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। কবি এখন অনেক বুঝেছেন, অনেক চিন্তা করেছেন, নিজের জীবনকে নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারই ফলে তাঁর অন্তরতম কবি-মানস এক গভীর সত্যে উপনীত হয়েছে।

এখন থেকে চলল আত্ম-বিশ্লেষণের ধারা। কবি বেশ বুঝতে পেরেছেন, "আয়ুর পশ্চিম-পথশেষে ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে"। তাই এই জীবনসন্ধ্যায বিশ্ব ও বিশ্বদেবতার চরণে কবি ও তাঁর জীবনের সার্থক-অসার্থক সমস্ত কবি-কৃতির ফলাফল অর্পণ করে প্রণাম জানিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ছুটি নিতে চেয়েছেন। "প্রণাম" কবিতায় কবিজীবনের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-বেদনার স্বীকৃতি শোনা যায়। সেখানে কবি বলেছেন—

……..…ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস।

… .. …

যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর কোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য-সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রনি রনি—ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশান্ত উল্লোলে। আমি, তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা।

জীবন ও জগতের অনিত্যের মাঝে নিত্যের লীলা, সীমা-বন্ধনের মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা কবি যেন শেষবারের মত আকণ্ঠ পান করে নিতে চাইলেন।

কিন্তু এর মধ্যেও যে বেদনার বিষ তাঁর স্পর্শালু কবিচিত্তকে বার বার জর্জরিত করেছিল তা অতি মর্মান্তিক। কতকগুলি প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার তাঁকে শোকে দুঃখে বেদনায় অভিভূত করে ফেলেছিল এই সময়ে। তিনি ভগবানের কাছে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এই প্রশ্ন করেছেন—

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ? ("প্রশ্ন")

যে দুঃসহ আঘাত কবি অন্তর্জীবনে লাভ করেছিলেন এই সব কবিতায় তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে।

'বীথিকা'য় কবির মোহমুক্তি ঘটেছে, "এখন অতীতের সকল বেদনা, ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা, লয়ে প্রীতি, লয়ে সুখস্মৃতি, আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া এই দেহ যেতেছে সরিয়া" 'রাত্রিরূপিণী'কে আহ্বান করে কবি তাঁর আলিঙ্গন কামনা করছেন, যে আলিঙ্গন কবির ক্ষুব্ধ জীবনে অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে শান্তির অমৃতধারা প্রবাহিত করে দেবে। বিশ্বচিত্তের অন্তরে যে শান্তির মহামন্ত্র মন্ত্রিত হচ্ছে, কবি প্রাণমন ভরে সেই শান্তি ও আনন্দের ধ্বনি শুনতে চাইছেন।

## ২৫

'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'জন্মদিনে', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'শেষ-লেখা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে কবি একটা স্থির বিশ্বাস ও নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এখানে কবি জীবন ও জীবনের অতীত, বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত রহস্যের জাল ছিন্ন করে স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাই এখানে সুখ দুঃখ বেদনা মিলে-মিশে আনন্দরূপ, সত্যরূপ ধারণ করেছে। কবি মুক্তি কামনা করেছিলেন আত্ম-নিগ্রহ করে বা বৈরাগ্য সাধন করে নয়, সে মুক্তি "সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে।" এই সহজ আনন্দ লাভই কবির জীবনের সহজ অথচ তীব্র কামনা

ছিল। সংসারের নানা দুঃখ দৈন্য গ্লানি মালিন্য কবিকে ব্যথিত করেছে সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে আনন্দলোকের কবি শান্ত-শিবের বাণী শুনেছেন। জীবনের কোন দুঃখই তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী করে তুলতে পারে নি; দুঃখ-বেদনার কাছে পরাজয় স্বীকার করা তাঁর ধর্ম ছিল না। তাই দুঃখ-বিজয়ী বীর আমাদের কবি প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

দুঃখ পেয়েছি দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে;
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ-কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চির-দিবসের শান্ত শিবের বাণী। ('সেঁজুতি')

মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়ে কবি যখন আরোগ্যের পথে এলেন তখন পৃথিবীকে আবার নূতন দৃষ্টি দিয়ে অভিস্নাত করে তুললেন। এই পুরাতন পৃথিবীকে কবি আবার নতুন করে ভালবাসলেন, এই পৃথিবী কবির কাছে আনন্দ-নন্দনভূমি বলে প্রতীয়মান হল। এ অনুভূতি কবির নূতন নয়, কিন্তু এর মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এই অনুভূতি উপনিষদের অনুভূতিও নয় বা আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি। কবির দুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে দুঃখের ভাববাদী কল্পনা উত্তর-জীবনে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এসেছে। এ অনুভূতি "দেহ-দুঃখ-হোমানলে" পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আজ কবির চোখে—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী। ('আরোগ্য')

আজ আবার নতুন করে মনে হয়েছে "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা"। প্রতিদিনের বিচিত্র তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতায় কবি যে সত্য সঞ্চয় করেছিলেন তার আলোকে এই উপলব্ধি তাঁকে বিদায়ক্ষণে আশ্বাসিত করেছিল যে "সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।"

এই ধূলিময় পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি নিবিড় অনুরাগ ও পরম প্রণতি জানিয়ে তাঁর ঋণ স্বীকার করে বলে গিয়েছেন—

………'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।' ('আরোগ্য')

# রবীন্দ্র-কাব্যে 'লীলাসঙ্গিনী'

রবীন্দ্রনাথের "জীবনদেবতা" একটি বিতর্কসঙ্কুল বিষয়। এই জীবন-দেবতাকে নিয়ে কত যে আলোচনা সমালোচনা, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক কাব্যিক ব্যাখ্যা হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, কবিবর্ণিত এই 'অধরা'র পিছু পিছু কবিকে যেমন চিরদিন ছুটতে হয়েছে, তেমনি তাঁর কাব্যের অগণিত ব্যাখ্যাকার ও ভাষ্যকারকেও সেই একই পথের অনুসরণ করতে হয়েছে। কবি এঁর আদি অন্ত না পেয়ে বলেছেন, "চিরদিন মোরে কাঁদালো হাসালো, চিরদিন দিল ফাঁকি।" যাকে ধরেও ধরা যায় না, পেয়েও পাওয়া হয় না, জেনেও জানার শেষ হয় না, তার ব্যাখ্যা বা স্বরূপনির্ণয় বুদ্ধির অগোচর, তা অনুভবসাপেক্ষ। এই আসল কথাটা মানুষ বুঝেও বুঝতে চায় না, তাই যাকে জানা সম্ভব নয় তাকেই যেন খুঁজে পেতে চায় সব থেকে বেশী। এই চির-অন্বেষণের শেষ নেই, সীমা নেই; অন্তবিহীন আশা জ্বালিয়ে রাখে কামনার অনির্বাণ দীপশিখাকে। তাই অন্তরের গভীরতম তলদেশ থেকে এই বেদনা গুঞ্জন করে ওঠে—"তোমারে কোথায় পাব তাই এ ক্রন্দন।"

এই "অর্ধপরিচিত প্রাণীটি"র সম্বন্ধে রবীন্দ্রপাঠকের কৌতূহলের সীমা নেই, তাই তারা কবিকে বার বার প্রশ্ন করে ব্যাকুল করে তুলেছে। কবি বিহ্বল এসব প্রশ্নে, উত্তর দিলেন—

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি পর
লোকের মাঝে,
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়,
"কে গো সে'—শুধায় তব পরিচয়—
"কে গো সে ?"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কী জানি, কী জানি।"
তুমি শুনে হাসো, তারা দুষে মোরে
কী দোষে।

অকরুণ পাঠক, ততোধিক অকরুণ সমালোচকবৃন্দ, তাঁদের নাছোড় দাবী—

"বলতেই হবে, এই 'তুমি'টি কে।" কবি অনেক ভেবে চিন্তে আবার বলতে চেষ্টা করলেন—"When the *Jivandevata* came to me, I felt an overwhelming joy, it seemed a discovery, new with me—in this deepest self seeking expression I wished to sink into it to give myself up to it. To-day, I am on the same plane as my readers. I am trying to find what the *Jivandevatu* was."

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে কবি যখন নিজে ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি সাধারণ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেই একজন। সাধারণ সমালোচকদের মধ্যে যেমন ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কবির মধ্যেও তা থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কাজেই তাঁর কাব্যের মাধ্যমেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করা ভাল।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা এখানে বলে নিতে চাই যে, কেউ যেন মনে না করেন যে "জীবনদেবতা" সম্বন্ধে বুঝি আব একটা তত্ত্ব বা তথ্য এখানে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে। কোনরকম তথ্য, তত্ত্ব বা গবেষণা করবাব কিছুমাত্র উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধের নেই, শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, "জীবনদেবতা" কবির কাছে বহু বিচিত্ররূপে দেখা দিয়েছেন, তার মধ্যে যে রূপটি আমাব অনুভূতিকে সব চেয়ে বেশী স্পর্শ করেছে সেইটুকুই মাত্র অঙ্কিত করতে চেষ্টা করব—তার অতিবিক্ত কিছু নয়।

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা করতে গিয়ে এর মূল প্রেরণাকে বুঝে নিলে রসোপলব্ধির সুবিধা হয়।

সমগ্র জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে প্রেরণা, কবি তাকেই "জীবনদেবতা" বলেছেন, শুধু তাই নয় তাঁকে বস্তুজগতের প্রাণ বলেও স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই বিশেষ সত্তাটি কবিব অন্তবের অন্তবালে বসে কবিকে কাব্যরচনার প্রেরণা জুগিয়েছেন। ইনি কবির অন্তরবাসী শিল্পীসত্তা—কবিপুরুষ। এই জীবন-দেবতার অনুভূতিতেই কবির শিল্পসাধনা, রসসাধনা ও সৌন্দর্যসাধনা চরম শীর্ষে উঠেছে। এই অনুভূতিই তাঁর রসজীবনের, শিল্পজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। কবি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। কবি বলেছেন—"আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে।...আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকার আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভাল-মন্দ সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়াছেন, তাঁকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি।...আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।" এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল শক্তি-উৎসরূপে, সমস্ত ভাব চিন্তা কর্মের নিয়ামকরূপে, জন্ম-জন্মান্তরের, রূপরূপান্তরের পরিচালকরূপে জীবনদেবতার এই বিচিত্র অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। এই জীবনদেবতা কবিজীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে রূপ দান করেছে, তাৎপর্য দান করেছে, বিশ্বচরাচরের ভিতর ঐক্যভাব এনে দিয়েছে, আনন্দের দ্বারা বিশ্বের ছোটবড় সকলের সঙ্গে কবিচিত্তকে যুক্ত করে দিয়েছে। এই অনুভূতি কবির কাব্যে গতি ও বৈচিত্র্য এনেছে, কবিকে চিরচঞ্চলের নিত্যসহচব করে তুলেছে। জীবনদেবতার লীলারহস্য প্রথম জীবনে কিছু অস্পষ্ট থাকলেও ক্রমশঃ তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতাকে প্রণয়িনীরূপেই কল্পনা করেছিলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে আরম্ভ করে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যের পূর্ব পর্যন্ত এই রূপ দেখতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। তারপর 'কল্পনা'র যুগ থেকে রূপান্তর লাভ। 'বলাকা'র যুগ থেকে আবার লীলাসঙ্গিনীর দর্শন লাভ। এই বিচিত্র চিত্রপট একটির পর একটি সহজেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুজীবনের এক পর্বকে "ভৃত্য-রাজতন্ত্র" নাম দিয়েছেন। এদের কঠিন নির্মম তর্জনীর ইঙ্গিতে কবিকে গণ্ডীবন্ধনে বন্দী হয়ে থাকতে হত। বন্দীজীবনের একটা দুঃসহ বেদনা-বোধ আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবুও মনে হয় কবির এই বন্দীজীবনের মধ্যে ভাবী জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য লুকানো ছিল। কবি তাঁর শিশুবেলাকার অনেক কথাই

আমাদের শুনিয়েছেন ; তার মধ্যে এক-একটি ঘটনা তাঁর শিশু-মানসদর্পণে যে প্রতিচ্ছবি ফেলেছিল তারই বিচ্ছুরিত আলোতে পরবর্তী কালে কবিকে আমরা আরও স্পষ্ট করে দেখবার সুযোগ পাই। কবি বাল্যকালের কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, জানলার খড়খড়ি খুলে প্রায় সমস্তটা দিন ধরে তিনি পুকুরটাকে ছবির মত দেখে কাটিয়ে দিতেন। বহুকাল পরে কবি গাইলেন, "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।" জীবন গোধূলির ক্ষীণালোকে এই পুকুরের স্মৃতি কবির মনে উদয় হল, তাকে অবলম্বন করে কবি "জল" কবিতা লিখলেন—

পুলকিত সাবধানে নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন অদৃশ্যের স্পর্শ
সর্ব গায়ে ধরিত জড়ায়ে।

শিশুকালে ভাগ্নী ইরাবতী ছিল কবির খেলার সাঙ্গিনী। সে "রাজার বাড়ী" সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে বালক রবীন্দ্রনাথের মন কি ভাবে বিস্ময়াকুল উতলা করে তুলত, সে কথা কবি অনেক জায়গাতেই বলেছেন। এই "অদৃশ্যের স্পর্শ" প্রথম জীবনে কবির কাছে কী যেন একটা অজানা শিহরণের মত বোধ হত। এর কোন অর্থ কবির কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পাই, এই অদৃশ্যের স্পর্শ অদৃশ্যই ছিল বটে কিন্তু কবি অন্তরের অন্তস্তলে তার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছেন। "রাজার বাড়ি"র রাজা হয়তো "আঁধার ঘরের রাজা"রূপেই পরে দেখা দিলেন।

কবির যৌবনে লেখা একখানি পত্রাংশে শৈশবের কথা তিনি এইরূপ লিখেছেন—"মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারদিক রহস্যে আবৃত ছিল।...পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড় বাদলা সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।"

এই যে একটা অপূর্ব রহস্যের অনুভূতি অকারণে অকস্মাৎ কবির মনে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে আনন্দচাঞ্চল্যে তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলত, তার কোন স্পষ্ট স্বরূপ বোঝা যায় নি, অথচ ভিতর থেকে কী একটা বৃহৎ অর্ধ-পরিচিত প্রাণী নানান মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইত। পরবর্তী জীবনে এই

স্মৃতি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়েছে, কিন্তু বিস্ময় ও রহস্যের ঘোর কোনদিনও কাটল না।

যাই হোক, কবিবর্ণিত এই অর্ধপরিচিত প্রাণীটির কিছুটা স্পষ্ট সাক্ষাৎ আমরা কবির প্রথম জীবনে রচিত 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যে পাই। মনে হয় কবি এর সাক্ষাৎ পূর্বেই পেয়েছেন, তাই অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্মনিবেদনের ভাবে বলতে পেরেছেন—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই না'ক তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল গো আলোকধারা।
ও মুখখানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমাপারা।

এই স্বীকারোক্তির বহু পরে আবার কবিকে বলতে শুনি—

.........দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য বিলীন নিত্য বিরহ—
জীবনে জাগাও প্রিয়ে—
কখন হৃদয়ে, কখন বাহিরে,
কখন আলোকে, কখন তিমিরে,
কখন স্বপনে, কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে॥

এ কথা আর বার বার বলবার প্রয়োজন হয় না যে, "নিত্য মিলনে নিত্য বিরহে"ই কবির সারা জীবন কেটেছে। প্রণয়ের এই তো ধরন!

'ভগ্নহৃদয়'-এর পরে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যে সুর বেজে চলেছে তা বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' প্রথম কবিতাটি "সন্ধ্যা"। সেখানে কবি নিজ হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করে সন্ধ্যার কাছে সান্ত্বনা কামনা করেছেন—

সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

কিন্তু এই "সঙ্গীহারা-হৃদয়ে"ও সঙ্গীর আবির্ভাব ক্ষণে ক্ষণে হয়েছে তার কয়েকটি নিদর্শন আছে ওই কাব্যে। এখানে কবি যে কথা বলেছেন,

মনে হয় সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরালে যে কবি-সত্তাটি বিরাজ করছে তা তাঁরই সুস্পষ্ট আভাস। কবি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার তুমি হেসেছিলে।
… … …
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাও নি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণীতানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ। ('সন্ধ্যাসঙ্গীত')

তারপর কত দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে আশা-নৈরাশ্যে, কবিকে এখনও স্বপ্নময়ীর কাছে প্রশ্ন করতে শুনি—

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে…
আমি যে তোমারে খুঁজি। ('চিত্রা')

প্রথম যৌবনের এই নীরব আঁখির স্বপ্নময় মোহময় অনুপ্রেরণায় কবির হৃদয়-বীণার সপ্ত তন্ত্রী বিচিত্র রাগিণীতে রণিত হয়ে উঠেছে। এই স্নেহের উৎস-নীড়ে বসে কবি যে গান শিখেছেন তা তাঁর নিজের নয়, তিনি শুধু গায়ক মাত্র। কণ্ঠ তাঁর স্বকীয়, কিন্তু সুর সংযোজনা করেছেন ভিন্ন জন—এক রহস্যময়ী নারী।

কৈশোর থেকে এই নারী কবির মনের উপর কী গভীর-গূঢ়, অন্তর্বাহী প্রভাব বিস্তার করেছিল সম্ভবতঃ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "মানসসুন্দরী"। এই কবিতাটি কবির মানসী-প্রতিমার পরিচয়পত্র বলা যেতে পারে। কবি লিখেছেন—

অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,

বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধ চেনাশোনা?

বাল্যের সঙ্গিনী "অর্থহীন, সত্য-মিথ্যা" কত খেলায় কত বিচিত্র কথায় কবি-চিত্তকে সম্মোহিত করে রাখত! তারপর একদিন যৌবন-বসন্তে কবি চকিত-বিস্ময়ে দেখলেন—

........খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসে আছ মহিষীর মত।
... ... ...
ছিলে খেলার সঙ্গিনা,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
... ... ...
সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে, তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত।

এই নারী কবির দৃষ্টিতে একটি মানসী মায়া, তিনি অনন্ত, তিনি অসীম, ভাব-জগতে তাঁকে নিয়ে কবির নিত্য-লীলার অন্ত ছিল না।

'প্রভাতসঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল', 'ছবি ও গান' প্রভৃতি কাব্যেও এই অদৃশ্য প্রাণীটি ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণা দেখা যায়। সেখানেও "যোগিয়া-রাগিণী গায় কে রে।" এখনও দেখা-না-পাওয়া চলছে—

এ কী রে আকুল ভাষা। প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্মরে মিশালো,
না জানি কাহারে চায়, তার দেখা নাহি পায়.
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।

চতুর্থীর চাঁদের আলোতে "দোঁহা পানে" দুজনে চেয়ে থাকে।

খেলে দোঁহে তবুও মেলে না, তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।

কিন্তু শরমবোধ কেটে যায়, কবির পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে। এই চোখে চোখ দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সহস্র হারানো সুখস্মৃতি জেগে ওঠে। কবির মনে হয়, কে বলে তুমি আমার অচেনা; তুমি আমার আত্মবিস্মরণ, অনন্তকালের সুখ

দুঃখ শোক, কত নব-জগতের কুসুম-কানন, কত নব-আকাশের চাঁদের আলো।

কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ।
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।

এই কবিতাটির ভাব পরে 'মানসী'-কাব্যে আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে কবি স্থির প্রত্যয় নিয়ে বলেছেন—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

শুধু তাই নয়—

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি যে, তুমি আমারি।

যার জন্য "জনমে জনমে যুগে যুগে" কবি প্রেমসম্ভার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন, তার পরিচয় 'মানসী'র প্রথম কবিতাতেই আছে। কবির চিত্ত-মাঝে বিশ্বজীবনের বিচিত্র তরঙ্গ এসে আঘাত করছে, মুহূর্তের জন্যও তার বিরাম নেই। ভাষাহীন সুখ-দুঃখের বিচিত্র ধ্বনি প্রতি মুহূর্তে অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। বিচিত্র কলরোল, বিচিত্র দুরাশা জাগিয়ে অন্তরকে ব্যথিত-ব্যাকুল করে তুলেছে। এই অনুভূতিকে কবি একান্ত আপনার মনে করে তাকে "আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে" গড়ে তুললেন মানসী-প্রতিমা। বহির্জগৎ কত গন্ধ গান দৃশ্য নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়, কিন্তু বিশ্ব সঙ্গীহারা বিরহী, ব্যথাভরা কত সুরে সে কবির হৃদযদ্বারে এসে কেঁদে আকুল হয়, কারণ সে চায় কবির মধুর সঙ্গলাভ করতে। কবিরও বিরহী প্রাণ সেই ব্যাকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে ওঠে। তখন তাঁর মর্মের মূর্তিমতী কামনা অন্তঃপুর-বাস ছেড়ে এসে সসীমের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে নানাভাবে সঙ্গ দান করে। এই পরিচিত রহস্যময়ীটি কবির জীবনে নানাভাবে, নানারূপে এসেছেন। এই প্রাণীটির সঙ্গে তাঁর "নিমিষে নিমিষে" মিলন ঘটেছে। কি সন্ধ্যায় কি প্রভাতে, কি গৃহকোণে, কি জনশূন্য ছাদে অনন্ত আকাশের তলে এই রহস্যময়ীর সঙ্গে তাঁর দেখা-

শোনা হত। বাল্যকালে এই সঙ্গীটি তাঁর কাছে এসেছিল খেলার সঙ্গিনী হয়ে, যৌবন-উন্মেষের প্রথম প্রভাতে দেখা দিল প্রিয়ারূপে, অন্তর-লক্ষ্মী-রূপে। এই অন্তর-লক্ষ্মীকে তিনি শুধু অন্তরেই উপলব্ধি করলেন না, বহির্বিশ্বেও তাঁর বিমোহিত রূপ দেখতে পেলেন। এই অন্তরবাসিনী বিশ্ব-প্রিয়াই কবির মানসী-প্রতিমা, কবিমানসের চিরন্তন সৃষ্টিরহস্য।

তাই দেখা যায় 'মানসী'-কাব্যে কবি মানসপ্রতিমা গড়ে তুলেছেন কিন্তু 'সোনার তরী'তে মানসসুন্দরী নিজে এসেই দেখা দিয়েছেন। এতক্ষণ প্রিয়ার অনুভূতি মনকে আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল, তবুও তার মধ্যে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি ছিল না। তাই কবি বাস্তব মূর্তিতে তাঁর মানসী প্রিয়াকে দেখতে চান—

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

অন্তরনিবাসিনী এখন আর শুধু অন্তরেই সীমাবদ্ধ নেই, সে আপনাকে বিকশিত করে তুলেছে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে। তাই 'সোনার তরী'তে চির-জনমের চিরসাথীকে "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে"। যেন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি জড়ানো আছে ওই দুটি তৃষিত আঁখিতে। অতীতের স্মৃতি কবির হৃদয়প্রান্তে চকিত আলোর মত দেখা দেয়—

পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি?

চিরজীবনের ঈপ্সিততমাকে কবি যেন নিবিড় সান্নিধ্যে পেলেন; তাই অপরিচয়ের লজ্জা ভয় সংকোচ কাটিয়ে কবি বেশ সহজভাবেই বললেন—

শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গ মন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া,
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।

এর পর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্জন করতে না পারলে জীবন যে অ-ধন্য হয়ে যায়। তাই "ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া" কবি লিখে দিলেন—

'অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।'

সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সমেত সমস্ত হৃদয়খানি উজাড় করে দিয়েও কেন তৃপ্তি নেই! কারণ এ যে "হৃদয়ের প্রেম", এ যে "পিরিতি-অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নোতুন হোয়।" কবিও তাই বললেন—

এ যে সখি, হৃদয়ের প্রেম—
সুখদুঃখবেদনার আদি অন্ত নাই যার,
চিরদৈন্য চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাত,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।
... ... ...
বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন্।

যে রহস্যময়ীকে অত্যন্ত কাছে মনে হয়েছিল, কাব্যশেষে দেখা গেল সে যেমন দূরে ছিল তেমনি দূরেই আছে।

শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর,
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'

'সোনার তরী'তে কবি কাম্যবস্তুকে পেয়ে-হারানোর ব্যথায় বেদনাকাতর, আশা-খিন্ন, ক্ষুব্ধ-অধীর। যেন মনে হচ্ছে আশা-নিরাশায় আরও অনেকদিন দুলতে হবে।

কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।

কবি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন, তাই মনের এই ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না। ওই কাব্যেই লিখলেন—

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে—
বুকের কাছে।

'চিত্রা'য় বুকের কাছে বসে নেই, মানসসুন্দরীর রূপ ধরে অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজিত। না-পাওয়ার যে বেদনা এতক্ষণ কবিকে অস্থির করে তুলেছিল তা এখন আত্মপ্রশান্তিতে ভরে উঠল। অন্তরের ধনকে অন্তরে না খুঁজে বাইরে অন্বেষণ করলে তাকে হারিয়ে ফেলতে হয়। তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—"তোমায় অন্তর হৈতে কে কৈল বাহির।" কবিও অনুরূপ সুরে গাইলেন—

আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি, হৃদয় পানে চাই নি।

আজ কবি পরিপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে দেখলেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

কিন্তু—

অন্তর-মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এক অখণ্ড অনুভূতি মানসসুন্দরীর রূপ ধারণ করে কবির অন্তরে পরিব্যাপ্ত এবং তিনি কবির জীবনকে বিকশিত করে তুলছেন। তিনি অন্তরে থেকে কবিকে প্রতি পদে, প্রতি কর্মে নিয়ন্ত্রিত করছেন। কবির নিজের কোন কথা নেই, কোন ভাষা নেই, কবিব মুখেব ভাষা কেড়ে নিযে সুন্দরী কৌতুকমযী তা বলেছেন। কবি তাই এই অন্তর-বাসিনী প্রেরণারূপিণীকে সম্বোধন করে বলছেন—

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবার
বলিতে দিতেছ কই?

শুধু তাই নয়, কবির জীবন নিয়েও তাঁর কৌতুকলীলা—

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

যদি মিলনই হল তবে আবার কেন ক্লান্তি-ভ্রান্তির কথা আসে? তখনই মনে সন্দেহ জাগে—তবে কি এ প্রেম নয়? মিছে শুধু প্রেমের ছলনা, শুধু কৌতুক-রহস্য? কবির মনেও শঙ্কা জাগে, কারণ যার উপর কোন দাবী নেই তার প্রেম "নিমেষে যায় টুটে"। তাই কবির মনে হয়েছে—যে ক'দিন আমায় তোমার ভাল লাগবে সেই ক'দিনই তুমি আমায় ভালবাসবে, কিন্তু যেদিন তোমার লীলা শেষ হবে, যেদিন ছন্দ যাবে কেটে, যেদিন গান যাবে থেমে, "আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ তব রহস্যপুর?" এত বড় মর্মপীড়িত কথা কবি মনের কোণে আশ্রয় দিতে পারেন না, তাই আবার মনকে বোঝাতে বসেন,—না না, তা যে হতে পারে না, এত স্নেহ-ভালবাসার পরও কি আবার সে ছলনা সম্ভব? কবির নিত্য-আশায়-উদ্ভাসিত মন প্রশ্ন করে—

জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি?
চিরদিবসের মর্মের ব্যথা,
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী;
মরণনিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্ত জনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি?

কিন্তু কি জানি, তুমি যখন আমার ললাট চুম্বন করবে, আমার সারা দেহ-মন-প্রাণ নব চেতনায় শিহরিত হয়ে উঠবে, তখন কি তোমাকে চেনবার ক্ষমতা আর আমার থাকবে?

এ জীবনে হয়তো তোমার দেখা আর কোনদিনও পাব না, তবুও আশার শেষ শিখাটি মনের প্রদীপে জ্বলতে থাকবে। বারে বারে ব্যর্থ হয়েও হয়তো চিরদিন দুরাশার পাছে পাছে ছুটতে হবে, কিন্তু তবুও তোমারই দেওয়া বেদনার ভার নিয়ে তোমাকেই খুঁজে ফিরব। "তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর যবে আমার জনম হবে ভোর।" কিন্তু বিদায়বেলা এটুকু না জানলে মন যে প্রবোধ মানে না। জীবনের সুখ দুঃখ সর্বস্ব ধন যাকে অর্পণ করলাম

সে কি তা গ্রহণ করেছে? এবং গ্রহণ করে কি সুখী হয়েছে? তাই কবির একান্ত আকুলিত প্রশ্ন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।

প্রেমাস্পদকে হৃদয়ের সবটুকু সুধা নিঃশেষ করে দিয়েও মনে হয় তার প্রেমের যথার্থ প্রতিদান বুঝি দেওয়া হল না। "যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না"—ব্যথা-ভরা শঙ্কা নিয়ে কবি তাঁর পরান-বঁধুকে প্রশ্ন করেছেন—আমার সব ব্যর্থতা কি তোমার মধ্যে সফলতা লাভ করেছে?

কী দেখিছ বঁধু, মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি?

যে সুরে তুমি এ বীণার তার বেঁধেছিলে সে সুর বার বার ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাই যদি তুমি বুঝে থাক যে তোমার আঘাতে আমার এ বীণার তার আর বেজে উঠবে না তবে এই জীর্ণতা দীনতা ক্ষীণতা অসারতা সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দাও। তারপর—

আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার চিরপুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।

প্রিয়ার সঙ্গে মান-অভিমান মিলন-বিচ্ছেদ সুখ-দুঃখ সব কিছুর যেন পরিসমাপ্তি হল অশ্রুজলে। এত আবেদন-নিবেদনের পরও সম্বন্ধটি খুব ঘনিষ্ঠ বা পাকা হল না। রহস্যময়ী রহস্যময়ীই হয়ে রইলেন। তাঁকে জানার শেষ কোনদিনও হল না। তাই কবি তাঁকে নানা ভাবে রূপে ও রসে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

এর পরের যুগে, সম্ভবতঃ 'কল্পনা'র যুগ থেকে, কবি যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ-মনে বিশ্রাম কামনা করছেন, যখন "ক্লান্তি টানে অঙ্গে মম প্রিয়ার বিনতি সম", তখন নূতন কর্তব্যভার নিয়ে নূতন পথে যাত্রা করবার জন্য সেই নিঠুরা মোহিনী "আবার আহ্বান" করেছেন এবং কবিও তাতে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। সেই ছলনাময়ীর বংশীধ্বনি একবার যে শুনেছে কোন বন্ধনই তাকে আর

বেঁধে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ছুটে সে যাবেই। কবির বেলায়ও তাই হল। আমরা দেখতে পেলাম তিনি অক্লান্ত ছুটে চলেছেন অ-ধরার পিছু পিছু।

'ক্ষণিকা'র চটুলতার মাঝেও কবির মর্মবেদনা উৎসারিত। কবি নিজেকে "পরামর্শ" দিয়েছেন ঘাটে তরী বাঁধতে, কাজ কি দুঃসাহসে ভর করে নূতন পথে যাত্রা করবার?…কিন্তু মিথ্যে হয়ে যায় সব পরামর্শ। অদৃষ্টে যার নৌকাডুবি আছে সে পরামর্শ নেবে কেন? নিয়তি যে তাকে টানছে দুর্নিবার আকর্ষণে। তাই তরী ভেসে যায় অকূল নীরে। অন্তরতম প্রিয়ার আহ্বানই সত্য হয়। কবিও নৈবেদ্য নিবেদনের জন্য প্রস্তুত হলেন। "সমাপ্তি" কবিতায় কবি বলছেন—

কখন সে পথ আপনি ফুরালো
সন্ধ্যা হল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।

কবি যেন স্বস্তি পেলেন, কারণ এবার প্রাণ-প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হবার আর কোন বাধা রইল না, এবার—

সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।—

এবার থেকে "তুমি আর আমি"র জীবন শুরু হল।

এ জীবনে যৌবনের উদ্দাম চঞ্চলতা নেই, ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নেই, না-পাওয়ার ব্যর্থ বেদনার তপ্ত গভীর নিঃশ্বাস নেই, আছে শুধু স্বচ্ছ সরল শান্ত-সমাহিত মৌনভাব। এ জীবন প্রেমের গভীর স্নিগ্ধতায় আত্মমগ্ন। এতক্ষণ কবির মন কত সংশয়-সন্দেহ-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিজড়িত ছিল; কিন্তু সে সংশয় এখন আর কবিকে পীড়া দিতে পারে না। প্রাপ্তি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, পূর্বের অস্পষ্টতা এখনও দূর হয় নি, তবুও কবিচিত্ত শান্ত নিঃসংশয়, সন্দেহ এখন নিজের উপর। তাই 'উৎসর্গ' কাব্যে দেখি—

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

কবিচিত্তের সংশয় কেটে গিয়েছে তার পরিচয় আছে এ কাব্যে। 'সোনার

তরী'তে প্রশ্ন আছে "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?" এখনও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় নি, তাই আস্থা কিছু কম। কিন্তু এখন—

কথাটি আমি শুধাব নাকো
তোমারে,
দাঁড়াব নাকো ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে
শুধাব নাকো তোমারে।

আমাকে নিয়ে এখন তোমার যা খুশি তাই কর। সংশয় যে কবির কেটে যাচ্ছে তা বেশ সহজেই বুঝতে পারা যায়। কারণ ক্রমশই নিজেকে "তিল-তুলসী" দিয়ে সমর্পণ করবার জন্য কবি যেন বড় ব্যাকুল, বড় অধীর হয়ে পড়েছেন। কবি এখন রহস্যময়ীর রহস্য আর উদ্‌ঘাটিত করতে চান না—পাছে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যায়। তাই অজানিতের সমস্যা এইভাবেই শেষ করলেন—

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি,
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

বিশ্বজীবনের অনন্ত কল্লোল কবির সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশের পথ পেয়েছে, তাই তো অন্তর্যামী দেবতা তাঁর চিত্তের মধ্যে আসন পেতে বসতে পেলেন। তাই পূর্বের রসসম্ভোগের জীবন স্মরণ করে কবি কতদিন ভেবেছেন "আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।" কিন্তু আজ আত্মপ্রত্যয় জেগেছে,

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ,
ওগো অন্তর্যামী দেব! ৮

বিশ্বজীবনের যুগ-যুগান্তরের বিরাট স্পন্দন কবির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত

অপরূপ জ্যোতিতে কবির সারা অন্তর উদ্‌ভাসিত। মাঝে মাঝে কবি চমকিত হয়ে উঠেছেন এই লীলায়—

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার?
...   ...   ...
তোমারি মিলন-শয্যা, হে মোর রাজন্‌,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন—
অসীম বিচিত্র কান্ত! ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ?

এই যে আনন্দ, এই যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, এ ঠিক প্রণয়-রীতির অনুরূপ নয়; এর মধ্যে পূজারতির সৌরভ আছে।

এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমর্পিব।

এখন কবি আবদারের সুরে বলছেন—সমস্ত জগতের আলো থেকে তুমি তোমার আলোতে আমাকে ডেকে নাও, "শান্ত অন্ধকার আমারে মিলাযে দিবে চরণে তোমার।"

বেশ উপলব্ধি কবা যায যে, কবিব মনেব সে সংশয বা সে বেদনার কারুণ্য কবিকে আর এখন কাতর করে তুলছে না। সবই যেন কবির কাছে সহজ সরল স্বচ্ছ মধুর হযে দেখা দিযেছে। অস্পষ্টতা বা অবিশ্বাসের গুরুভার আর তো নেই, কাজেই কবির মনে বেশ একটা প্রশান্ত নির্ভরের ভাব এসেছে। শুধু নির্ভর করে থাকলেই যেন সবটুকু পাওযা হল না। তাই সর্বান্তঃকরণে জীবনদেবতার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্জন করে তবে তৃপ্তি।

এখন ইনি জীবনদবতা—প্রণযী নন। পূর্বজীবনে যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাতে ছিল কেবল অনন্ত রহস্য, আকুল প্রশ্ন, অব্যক্ত বেদনা, কিন্তু এখন প্রশান্ত বিশ্বাস, একান্ত আত্মবিলোপ, পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এ ভাবটি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় "সোনার তরী" "নিরুদ্দেশ যাত্রা" "শেষ খেয়া" ও "খেয়া' এই কয়টি কবিতায়। প্রথম কবিতাটিতে কবি এক অজ্ঞাত রহস্যময়ীর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত; কিন্তু দানের মধ্যেও যে নিজেকে একটু লুকিয়ে রেখেছেন তা বোঝা যায়। "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র কবি

প্রশ্ন তুললেন, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?" তখনও জীবন-দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি, তাই সেখানে আছে আকুলতা-ব্যাকুলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কিন্তু "শেষ খেয়া" ও "খেয়া" কবিতায় কেমন একটা সহজ প্রশান্তি আছে যা মনকে বিমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত করে দেয়। এখানে যৌবন-চাঞ্চল্যের সে ক্লান্তি সে অবসাদ সে মাদকতা নেই, আছে স্থির প্রশান্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এখনও সোনার তরীর মাঝির সঙ্গে "খেয়ার নেয়ে"র পার্থক্য বিশেষ কিছু ঘটে নি —দুইই অস্পষ্ট। তবুও খেয়ার নেয়েকে কবি না বুঝেও বুঝেছেন—কাজেই এই আহ্বানই যথেষ্ট।

এর পর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'। 'খেয়া' কাব্য পর্যন্ত দেখা যায়, কবি পরম-রমণীয়কে আরও নিবিড় করে পাবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা আর আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দূরে থাকায় কল্পনা ও আবেগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কাব্যখানি অপরূপ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি এই যুগের রচনায় এই আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হয়েছে, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিত হয়েছে কঠিন সাধনা, তপস্যা। একদিন যে দুঃখ-বেদনা পেয়েছেন তা যেন পূজা-উপচারে ধন্য হয়ে উঠল। কবি তাই বলেছেন, "আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।" এই ব্যথার গানই কবির পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি। পূর্বেকার চঞ্চলতা, মুখরতা নীরব হয়েছে। একবার কৌতুকময়ীকে কবি বলেছিলেন, আমায় তুমি কিছু বলতে দাও না, তুমি যা বলাও আমি তাই বলি। কবি কিছু বলবার জন্য মুখর। আজ কবির মধ্যে কী পরিবর্তন! কবি একান্তভাবে কামনা করছেন—

এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
… … …
যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন-মরণে,
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।

আজ মানসসুন্দরীর সঙ্গে নিরালায় মধুগুঞ্জন স্তব্ধ, এখন জীবনদেবতার সঙ্গে কথা নয়, শুধু গান—যা কবিকে নিয়ে যাবে নিত্য সৌন্দর্যলোকে, যা দেহ-মন-প্রাণকে ভরিয়ে দেবে অনির্বচনীয় মধুরতায়। 'গীতাঞ্জলি'তে যিনি দেখা দিলেন

'তিনি শুধু প্রিয় বা প্রিয়তম নন। তিনি জীবনস্বামী, প্রভু, দেবতা। দেবতাকে সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে দূর থেকে পূজার ফুল দেওয়া যায়, কিন্তু তাঁকে "তুমি আমারি যে গো তুমি আমারি" বলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিতে কোথায় যেন বাধে। তাই 'গীতাঞ্জলি'তে—

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে,
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু'হাত ধরি নে।

না, না, এতখানি ব্যবধান থাকতে পারে না। বক্ষের অঞ্চল, কণ্ঠের মালা, অঙ্গের শিহরণ যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে তাই কত অসহনীয়, আর এ দূরত্ব যেন অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র—অনন্ত অসীম। তাই কবি 'গীতিমাল্যে' আবার সেই পুরাতন বধূর কণ্ঠে প্রীতিমাল্য পরিয়ে দূরত্বের বাধা দূর করে তাকে নিকট-সান্নিধ্য দান করলেন।

এখানে এসে দেখা গেল, সেই অজানা সকল-জানার বুকের মাঝে দাঁড়িয়ে। এই অজানা যে সর্বত্র বিরাজিত তা বোঝা গেল "ফুলের বাসে","দক্ষিণ হাওয়া"য়, "পাতার কাঁপুনি"তে। মনে হল একটু হাত বাড়ালেই "ছুঁতে পারি বসনখানি"। কবির মনে বিস্ময় জাগে—

এ কি গভীর, এ কি মধুর
এ কি হাসি পরান-বঁধুর,
এ কি নীরব চাহনি!"

এই চাহনির কাছে নিজেকে বিলিয়ে না দিযে কে কবে আত্মগোপন করে থাকতে পেরেছে? এমন সুদুর্লভ মুহূর্ত জীবনে ক'বারই বা আসে? তাই কবির এত ত্বরা—

আমার চির জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমিষে।

দান করবার পর চকিতে মনে হয় 'কো তুঁহু বোলবি মোয়"।

কে গো অন্তরতর সে—
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
... ... ... ...

কত দিন আসে কত যুগ যায়,
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

তবুও "কই তুমি কই এই কাঁদনের নয়নজলে গলে।" তৃপ্তিব বিরতি চাই না, অতৃপ্তির চিবগতি চাই। কেবল উপলব্ধির শান্তি চাই না, নব-নব বেদনাময় চৈতন্য চাই। তাই 'গীতাঞ্জলি'তে এই বেদনাব একটা সার্থক রূপ দেখতে এই বেদনাব গভীর মূল্য আছে তা বোঝা গেল এবং এতেই কবিজীবন ধন্য হল। আঘাত দিয়ে চেতনাব বেদনা জাগ্রত কববাব পব কবিব সঙ্গে তাঁর প্রিযতমেব আবাব মিলন হল। দুঃখ-বেদনাব অভিসাবেই এ মিলন সার্থক। গৃহছাডা কবে, আরাম হতে ছিন্ন কবে জনম-মবণ-পাবে যে সঙ্গে কবে নিয়ে এল, সে এল পথিক সেজে। তাই "দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীব শান্তি এ যে।" দীর্ঘদিন পবে এত দিনেব কান্না ও জাগবণ সার্থক হল। আজকেব আত্মসমর্পণেব পব আব কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, তাই আত্মনিবেদনেব এই ভাব—

আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।

প্রিযতমেব প্রেমের মর্ম কবি বুঝতে পেবেছেন,

সামান্য নয তব প্রেমের দান—
বড় কঠিন ব্যথা এ যে,
বড কঠিন টান।

কত বেদনা, কত আশাভঙ্গেব পব এই প্রেম এমন কঠিন দানা বাঁধতে পেবেছে সে কথাই কবি এখানে বলেছেন।

নিবিডতম বেদনাব পব যে মিলন হল তা অপূর্ব আনন্দঘন। এ পবিপূর্ণ মিলনদৃশ্যেব ছবি এব পূর্বে খুব বেশী দেখা যায নি। আন্তবিকতায ভবা এ মিলনে বহস্যেব বা ছলনাব কোন অবকাশ নেই, তাই এব ভাষা সবলসুন্দব-ভাব অনির্বচনীয, অব্যক্ত। মিলনেব একটি চিত্র দেখলেই তা বোঝা যায। কবি মিলনলীলাব জন্য প্রিযতমাকে জাগাতে চাইছেন—

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে—
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো।

...          ...          ...

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে,
প্রিয়তম হে জাগো জাগো।

পরম নিশ্চিন্তে ও গভীর বিশ্বাসে এবার আত্মসমর্পণের পালা—

অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও,
লও গো আমার প্রাণ—
এবার প্রভু লও গো শেষের দান।

শেষ দান করেও কেন অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধেই রইল? আর কী চাই? কবি কোন অবস্থাতেই যে কোনদিন চরম সুখী হন নি তা আমরা বার বার দেখেছি। তাই এখনও যে ব্যথা-ব্যাকুলতা থাকবে তা বোঝা যায়। এতে তিনি বরং গর্বই বোধ করেছেন। তিনি নিজের সাধনরীতি জানতেন। তাঁর সাধনা কোনদিনও শেষ হবার নয়, "নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা"—এ তাঁর যথেষ্ট জানা ছিল, তবুও কোনদিন পেয়ে-পাওয়া ফুরিয়ে ফেলতে চান নি। চিরন্তন পথিকের মনোবৃত্তি তাঁকে কোন অবস্থাতেই স্থির থাকতে দেয় নি। "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী"—এই তো কবির মর্মকথা। চির-যৌবনের এই তো প্রেরণা। তাই দেখি 'বলাকা' কাব্যে জীবনদেবতা দেখা দিয়েছেন চির-যৌবনমূর্তি নিয়ে, সেই পুরাতন নিত্য-নূতন রূপ নিয়ে, সেই পরান-বঁধু রূপে। "অপরিচিতের চির পরিচয়" লাভ করে কবি প্রিয়াকে নিয়ে এলেন জীবনের খরস্রোতে।

তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা।
এমনি করেই আসা যাওয়ার ডোরে—
প্রেমেরি জাল বোনা।

নিরুদ্দেশের ডাক এসেছে—সে ডাকের সঙ্গে 'সোনার তরী'র নিরুদ্দেশ যাত্রার পার্থক্য দেখা যায়। এ ডাক ভীষণ, ভয়ানক; রহস্যের আবরণে স্মিত হাস্য এ নয়। সুন্দরের মূর্তিতে প্রিয়তম যখন এসেছিলেন তখন কবি তাঁকে ঠিকমত চিনে নিতে পারেন নি, তাই আবার এই নূতন অভিসারের প্রয়োজনবোধ। কবি প্রাণ মন খুলে সকলকে আহ্বান করেছেন—

সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয় রে সেজে,
আয় না বধূর বেশে গো,
ঐ বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।

এই মিলনের মধ্যে ভয় লজ্জা সংকোচ নেই, দ্বিধায় জড়িত পদে প্রিয়সন্নিধানে যাওয়া এ নয়, এ মিলন ভীষণ-সুন্দর। ঐ অভিসারক আসছে "মত্ত সাগর" পাড়ি দিয়ে। 'সোনার তরী'তে তাঁকে মাঝিরূপে আসতে দেখেছি, 'উৎসর্গে'র নেয়েকে চেনা হয়েছে, কিন্তু এ নেয়েকে দেখা এই প্রথম। এ নেয়ে আসছে মত্ত সাগর পাড়ি দিয়ে, ঝড়ের গহন রাত্রিতে এর অভিসার। এই ঝড়ের দুর্দিন রাত্রিতে কেন সে আসছে, কার কাছেই বা আসছে? বড় প্রয়োজনে বড় কাছেই আসছে—

অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী—
বিরহী মোর নেয়ে।

এই বিবাগী নেয়ে কী রতন নিয়ে আসছে কাকে দেবার জন্য তাই বা কে জানে! এ রতন মানিক নয়, মণি নয়, মুক্তা নয়, শুধু রজনীগন্ধার একটি মাত্র গুচ্ছ— "কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার নবীন আমার নেয়ে?" এই অদিনে যার জন্য নেয়ে বেরিয়েছে সে বড ভাগ্যবতী, সে থাকে পথের এক পাশে। তাকে বরণ করবার জন্য বর আসছে তার—

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি।
দীপের আলো বাদল বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ঐ যে আসে নেয়ে।

এই বিবাগী আনমনা উন্মনা নেয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বিজয়ী বীরের মত আসবে না, কোন সমারোহ নেই তার—

বাজবে না কো তুরী-ভেরী, জানবে না কো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলকপরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ,
কূলে আসবে নেয়ে।

এ যাত্রায় কোন সংশয় নেই, দ্বিধা নেই, অপরিচয়ের প্রশ্ন নেই; বিশ্বাস এখানে দৃঢ়, তাই আত্মসমর্পণ সহজ সুন্দর। 'বলাকা'য় জীবনদেবতা আবার পূর্বের সেই অস্পষ্টতা লাভ করেছেন সত্যি, কিন্তু যত অস্পষ্টই তিনি হোন না কেন, তাঁর প্রতি যে বিশ্বাস আছে তার কোন তুলনা নেই। কবি বুঝেছেন, জীবনদেবতা চিরপরিচয়ের মাঝেও অপরিচিত।

'পূরবী'তেও জানা-অজানার আলো-ছায়া নিয়ে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কবি কোনও দিন সকল সমস্যার সমাধান করে সমে এসে দাঁড়ি টানতে চান নি— এমনি করেই চলেছে "প্রেমেরি জাল বোনা"। তবে 'পূরবী'তে দেখতে পাই, কবি বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছেন যে যাকে পাওয়া যায় না তাকে কেবল প্রেমের মধ্য দিয়েই ধরা যায়, অজানা যে জন, জানার মধ্য দিয়ে তাঁর নিত্য-লীলা চলছে। তাই জীবনদেবতা অচেনা অজানা হতে পারেন কিন্তু তাঁর নিত্য প্রকাশ প্রেমের মধ্য দিয়ে কি ঘটছে না? জীবনে এ আশ্বাস যদি না থাকে তবে কিসের এত আকূতি! সে আমার না-পাওয়ায় আছে, অ-দেখায় আছে— এই সান্ত্বনা যদি না রইল তবে "জীবনপোড়ানো এ হোম-অনল" জ্বালানোর প্রয়োজন কী ছিল?

বহুদিন পরে 'সোনার তরী'র "মানসসুন্দরী" 'পূরবী'তে "লীলাসঙ্গিনী"রূপে আবির্ভূতা হলেন—

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি—
কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী?

কবির পূর্বজীবনের স্মৃতি আবাব "বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের" আলোতে জেগে উঠল। জীবনের গোধূলিলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়, এখনও পরান-বঁধু অ-দেখা, না-পাওয়া, কিন্তু কবির মন বলছে—

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে,
সুবাস আভাস খানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।
বুঝিয়াছি অনুভবে,
বনমর্মররবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।

এ যেন শ্রীরাধার 'ভাবসম্মিলনে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।" কিন্তু রাধার মত কবি তো নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না এখনও—

হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে।

গোপন হৃদয়মাঝে কে যেন চুপি চুপি তার অভিসারের কথা বলে গেল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে দূর থেকে কে যেন কিঙ্কিণী বাজিয়ে চলেছে।

ওগো মোর না পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে,
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
'কী কহো' সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে—
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

না-পাওয়ার বন্দনা এমনি করেই মানুষকে চিরযৌবনরসমাধুর্যে ভরিয়ে রাখে। এর কোন স্বরূপনির্ণয় নেই, ব্যাখ্যা নেই, শেষ কথা নেই। "শেষ নাই যার শেষ কথা কে বলবে?"

# রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব

## ১

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য-তীর্থ পরিক্রম করলে এটি স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, উপনিষদের স্তনরসে রবীন্দ্রমানস পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কানে উপনিষদের এই বাণী শুনিয়েছিলেন যে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং।" অর্থাৎ যা-কিছু যত তুচ্ছই হোক না কেন, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা আবরণীয, কাজেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, অন্য কারও ঐশ্বর্যে লোভ কোরো না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্মের ব্যাপ্তি। একমাত্র তিনিই "রসো বৈ সঃ"। অর্থাৎ তাঁকে কোন বস্তুস্বরূপে বা মানবীয় নামে পরিচিত করানো যায় না; তিনি অনুভববেদ্য কোন সত্তা নন। তিনি পূর্ণ, তিনি আনন্দ।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, উপনিষদের এই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ এবং বৈদান্তিক মায়াবাদ—এর কোনটিকেই কবি একক ভাবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। বহুবিচিত্র অনুভূতি ও তত্ত্ব তাঁর জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হয়ে এক অপরূপ নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্যে একটি বিরাট সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তাই কোন একটি বিষয়কেই তিনি চরম এবং পরম ভাবতে পারেন নি। তাঁর সমগ্র জীবন বা সাহিত্যের মধ্যে যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় তবে বিস্মিত পুলকে এ জিনিস আমরা দেখতে পাই যে, বিচিত্র চিন্তারাশি, ভাব কল্পনা, অনুভূতি উপলব্ধি সব যেন একটি শতদল পদ্মের মত আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে রয়েছে। এর কোন তুলনা নেই, এর কোন দ্বৈত নেই—এ সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব সম্পদ। উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব, বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব ও লীলাবাদ, বের্গসঁর গতিতত্ত্ব, হেলেনীয় দর্শনতত্ত্ব, সুফী কবিদের সহজীয়া তত্ত্ব—সব কিছুই রবীন্দ্রমানসকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সব কবির নিজস্ব অনুভূতির বকযন্ত্রে পরিস্রুত হয়ে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এ কথা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের স্তনরসে পরিপুষ্ট ও

বর্ধিত হলেও বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের আভাসে তাঁর কাব্য বেশী প্রভাবিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ এই যে, বৈষ্ণব ধর্মেও বলে যে তিনিই একমাত্র রসস্বরূপ, তিনি অখিল রসামৃতসিন্ধু। জীবাত্মা রাধা সেই অমৃত সিন্ধুর উদ্দেশ্যে চিরদিন অভিসারে চলেছে। এর কোন বিরাম নেই, বিরতি নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানজীবনে এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব এবং উপনিষদের অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে মূলগত কোন বিরোধ নেই।

## ২

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কবি বৈষ্ণব পদকর্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কবি একটি চিঠিতে লিখেছেন—"আমার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।" এই বালক-বয়সেই তিনি পদাবলীর ভাব ভাষা অনুসরণ করে ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে তাঁর নিজরচিত বৈষ্ণব পদ প্রকাশিত করেন। বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ অস্পষ্ট আর ধ্বনিসুকোমল ছিল বলেই যেন সেগুলি তাঁর বেশী ভাল লাগত।

তারপর কবি বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তাঁর সেই পরম বিশ্বাসটির সন্ধান পেলেন যে, এই বহুবিচিত্র বাস্তব জগৎ একেবারে নিরর্থক মিথ্যা মায়ামোহ নয়, এই বিশাল সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক বিরাট শক্তি—সে শক্তি মিথ্যা নয় বা ভ্রম নয়। সে শক্তি বিধাতা-পুরুষের আপন শক্তি। এই শক্তি প্রথম জীবন থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁরই অনন্ত লীলা কবি সৃষ্টির অনন্ত প্রবাহে নিরীক্ষণ করেছেন। বৈষ্ণব সাধকেরাও বলেন, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, তাঁর সেই সৃষ্টির আন্তর সত্তা শ্রীরাধা। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে চলেছে অনন্ত লীলাবৈচিত্র্য। এই লীলা বৈষ্ণব-কাব্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যেও নানা ভাবে, রূপে ও রসে ব্যক্ত হয়েছে।

সৃষ্টির মূলে অদ্বিতীয় একের বহু হবার ইচ্ছা—"একোঽহং বহুস্যাম্" বলে যিনি নিজেকে কোটি সৃষ্টির মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে পরিব্যক্ত হয়ে আপন মাধুরী আপনি অনুভব করছেন, সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর লীলার অঙ্গ।

তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।

এই লীলা প্রকৃত পক্ষে নিজের সঙ্গেই নিজের লীলা। রবীন্দ্র-কাব্যে এই যে রসদৃষ্টি, এ বৈষ্ণবদেরই রসদৃষ্টি।

কবির কাব্যে আমরা দেখি, কবি ভগবানকে কখনও দেখেছেন অদ্বৈত ব্রহ্ম-রূপে—এখানে তিনি পিতা প্রভু সৃষ্টিকর্তা, সত্য-শিব-সুন্দরের আনন্দময় মূর্তি; তিনি অসীম, বিপুল তাঁর শক্তি, অসীম তার ঐশ্বর্য; কখনও দেখেছেন লীলাময়-রূপে—এখানে তিনি সখা, প্রিয়তম, মাধুর্যের রস-সম্ভোগের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে অনুভব করেছেন; কখনও অনুভব করেছেন অজানা চিররহস্যময় নিরন্তর অগ্রসরমাণ বংশীবাদক পথিকরূপে। এর থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, রূপের অনুভূতিতে উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু তারপর বৈষ্ণব-দর্শনের সাদৃশ্যই বেশী।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলে ভগবান একমেবাদ্বিতীয়ম্, কিন্তু "স বৈ (একাকী) নৈব রেমে তস্মাৎ একাকী ন রমণে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ। সেই একমেবাদ্বৈত একাকী রমিত হইলেন না—তিনি দ্বৈত ইচ্ছা করিলেন, সেই নিঃসঙ্গ সঙ্গিনীর কামনা করিলেন। তাঁর মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি বিমিশ্রিত একাকার ছিল। এখন তিনি আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে পতি ও পত্নী হলেন। বৈষ্ণব-দর্শনেও এই পতি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং এই পত্নী পরা-প্রকৃতি শ্রীরাধা।

রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ,
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে বলে রাধার প্রেম আস্বাদন করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ছেড়ে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

গোলোকবিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে।

আরও বলেছেন—

রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা,
গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া দেহা।

রাধার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—সে শুধু "কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি—হ্লাদিনী শক্তি।" শ্রীভগবানের ভিতর রয়েছে অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনা, কিন্তু এই অন্তর্নিহিত প্রেম-শক্তিকে তিনি নিজে আস্বাদন করতে পারেন না যতক্ষণ না সে প্রেম প্রকাশ লাভ করছে মহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর ভিতর দিয়ে—

আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপান চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

শ্রীরাধার প্রাণযমুনায় অবগাহন করেই শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করলেন নিজের অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনাকে। শ্রীভগবান যেমন নিজের পূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করলেন শ্রীরাধার ভিতরে, তেমনি শ্রীরাধাও কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে নিজের পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন। রাধার জীবন যৌবন সার্থক হল। তাই শ্যামরূপে রূপসী, শ্যামগরবে গরবিণী রাধা বলছেন—

সখীগণে বলে শ্যামসোহাগিনী
গরবে ভরল দে।
হামারি গৌরব তুঁহু বাঢ়য়লি
অব টুটাযব কে॥

এমনি করেই পরস্পর পরস্পরকে সৃষ্টি করে চলেছে।

বৈদান্তিক দর্শনে ভগবানকে নির্বিশেষভাবে দেখে, আর বৈষ্ণব দর্শনে সবিশেষভাবে—নির্বিকল্পভাবে ও সবিকল্পভাবে। নির্বিশেষভাবে তিনি পরম ব্রহ্ম এবং সবিশেষভাবে তিনি ভগবান্।

বৈদান্তিকভাবে ভাবিত সাধক সংবাপন দ্বারা ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করে তাঁর সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, আর বৈষ্ণবভাবে ভাবিত সাধক আরাধনা দ্বারা ভগবানের পরানুরক্তি বা প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হন। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের প্রণালীও দ্বিবিধ—বৈদান্তিকের প্রণালী প্রণিধান, বৈষ্ণবের প্রণালী প্রেম। বৈদান্তিক প্রকৃতির কাছে ভগবান নির্বিশেষ, নিগু'ণ, নির্বিকল্পভাবে ধরা দেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতমং বিজানতাম্, কিন্তু বৈষ্ণব প্রকৃতির কাছে ভগবান সবিশেষ, সগুণ, সবিকল্পভাবে ধরা দেন। কদাচিৎ কোন কোন মিস্টিকের অনুভূতিতে এই দুই অনুভূতির অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই অসাধারণ রোমান্টিক মিস্টিকের পর্যায়ে পড়েন।

৩

উপনিষদের ভাবে ভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে নির্বিকল্প নিরুপাধি রূপে ভাবতে পারেন নি বা একেবারে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ বা সমাধি, তাও তিনি কামনা করেন নি। আবার বৈষ্ণব মতে, আজ না হোক কাল না হোক, শত লক্ষ যুগ পরে হলেও তাঁর সঙ্গে মিলন হবেই—এ ভাবও কবির মধ্যে নেই। কবি বার বার বলেছেন, তোমায় পেয়ে পাওয়া ফুরিয়ে ফেলতে চাই না, তোমার পিছনে আমায় ছুটতে দাও; এই ছোটাতেই তোমায় পাওয়া, চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তো পাওয়া। কবি বলেছেন—

• তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর।

মহামিলনের শান্তিতে তাঁর পথ সীমিত হয় নি। বৈষ্ণব পদে তন্ময়তা আছে, দেহ মন সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু রহস্যময়তা নেই। মিলনে নিজেকে স্বতন্ত্র করে উপলব্ধি করবার আদর্শ নেই। রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের পূজারী। এই রহস্যময় তাঁর কাছে কোন একটি মাত্র রূপে ধরা দেন নি। বিচিত্র পরিবেশে, বিচিত্র রূপে তিনি কবিকে নিয়ত সঙ্গ দান করেছেন। সুন্দররূপে, রুদ্ররূপে, পিতারূপে, প্রেয়সীরূপে সর্বভাবকল্পনায় তিনি কবির নিত্যসহচর। রবীন্দ্র-কাব্যে শুধু অন্বেষণঃ কবির চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রতিটি ভাবনা উদ্দীপিত। তাই এতে এত ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য। অসীমের, অনন্তের সন্ধানই রবীন্দ্র-সাধনা ও সাহিত্যের মূল সুর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছে। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমার মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গলাভ করিতে চায় প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনার ভূমিকা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—'সীমার মধ্যেই অসীমের মিলনসাধনের পালা'।" এই সাধনই

বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা। যে রূপের ভিতর দিয়ে ভাবের প্রকাশ এবং ভাবের ভিতর দিয়ে রূপের সার্থকতা, এই দৃষ্টিই বৈষ্ণব দৃষ্টি। তাই এই সীমাবদ্ধ জগৎ বা সীমাবদ্ধ মানবজীবনকে কবি কোন-দিন নিরর্থক বা অসত্য ভাবতে পারেন নি। কবি উপলব্ধি করেছেন, অসীম অনন্ত আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ ; এই সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর নিত্যলীলা। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জড় ও চিন্ময়, সান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড সব কিছুই মিলে মিশে এক হয়ে রয়েছে, কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। একে অন্যের অপেক্ষা রাখে। তাতেই পরস্পর পরস্পরের পূর্ণের স্বাদ লাভ করে। অনন্তের প্রেমতৃষ্ণাও অনন্ত, জীবের প্রেম না হলে তাঁর লীলা সার্থক হয় না। ভগবান অনাদি অনন্ত নির্বিকল্প হয়েও প্রেমে সান্তের মধ্যে ধরা দিয়েছেন। মানুষও তেমনি নিজের প্রেম নিবেদনের জন্য ব্যাকুল। মানুষের প্রেমের জন্য তিনি যেমন নিত্য কাঙাল, মানুষেব প্রেমও তেমনি তাঁর উদ্দেশ্যে অনন্তকাল ছুটে চলেছে। জীবাত্মার প্রতি প্রেমেব এই অনন্ত প্রবাহ ছাড়া পরমাত্মার সার্থকতা নেই, পূর্ণতা নেই। তাই বৈষ্ণবভক্ত কল্পনা করেছেন, ব্রহ্ম আপনার অন্তর্নিহিত প্রেমতৃষ্ণাকে সার্থক করবার জন্য আপনার হ্লাদিনী শক্তিকে রাধারূপে প্রকটিত করেছেন এবং নিজে কৃষ্ণরূপে নরদেহ ধারণ করেছেন। তাঁর এই নরদেহে আবির্ভাবের ব্যাখ্যাস্বরূপ বৈষ্ণব কবি বলেছেন—"রস আস্বাদিতে আসি কৈল অবতার।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ।" সসীমের প্রেম উপভোগ না করলে অসীম যে অপূর্ণ ; সে তো লীলাময়, রসময় হতে পারে না। তাই কবি বলেছেন—

আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো ওই সূয তারা সকলি নিষ্ফল।

আমাকে নইলে তোমার লীলা অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টি সবই যে শূন্য হয়ে যায়। আমি যখন ছিলাম না, অর্থাৎ তুমি যখন এই বিশ্বসৃষ্টি কর নি, তখন কিন্তু তোমার কারও জন্য পথ-চাওয়া ছিল না—

আমি এলাম, এল তোমার ফাগুনভরা আনন্দ—
জীবন-মরণ-তুফান তোলা ব্যাকুল বসন্ত।

লীলাময়ের গভীর প্রেমের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে,

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

যার যে জিনিসের অভাব থাকে সে সেইটাই চায়, অসীমের সীমা নেই তাই সে সীমার স্পর্শ পেতে চায়—

আমার পরশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে,
কেউ তো জানে না তা।

চণ্ডীদাসের পদে আমরা পাই যে, রাধার প্রেমরস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ ঐশ্বর্যের জগৎ গোলোক ছেড়ে মাধুর্যের জগৎ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সীমার পরশ পাবার জন্য অসীমের এই-যে ব্যাকুলতা, এর প্রকাশও আমরা কবির কাব্যে বহু জায়গায় বহুরূপে লাভ করি। প্রেমের গভীর স্বচ্ছ অনুভূতি নিয়ে কবি বলেছেন—

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে—
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে থাকা সফল হবে।

প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করবার জন্য দেবতাকে বিভিন্ন রূপে ও ভাবে মানুষের হৃদয়রাজ্যে নামতেই হবে। তাই মানুষ তাঁকে পরমপ্রিয়তমরূপে বন্ধুরূপে সন্তানরূপে পেয়ে হৃদয়কে তৃপ্ত করতে চায়। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব প্রেম সম্বন্ধে কবির যথার্থ মনোভাবটি আমরা তাঁর Religion of Man গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি লিখেছেন—"Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poet of the Vaishnava sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the obvious meaning of these love poems.······I was sure that these poets were speaking about the supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—the love of nature's beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between man and Man the Divine, the

eternal relation which has the relationship of mutual dependence for a fulfilment that needs perfect union of individuals and the universal."

শ্রদ্ধেয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এর বঙ্গানুবাদ এইরকম করেছেন—"সৌভাগ্যবশতঃ শৈশবে বৈষ্ণব কবিদের রচিত কতকগুলি প্রাচীন গীতি-কবিতার সংগ্রহ আমার হাতে পড়ে। এই প্রেমগীতিগুলির আপাতপ্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে একটা গভীর ভাব খুঁজিয়া পাইলাম।......আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম, এই কবিগণ এক পরম প্রেমিকের কথা বলিতেছেন—যে প্রেমময়ের স্পর্শ আমরা অনুভব করি আমাদের সকল প্রেম-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া - প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমে, প্রাণীদের প্রেমে, শিশু, সঙ্গী ও প্রেমাস্পদ প্রভৃতি সকলের প্রেমের ভিতর দিয়া সে প্রেম আমাদের সত্যের চেতনাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে। তাঁহারা সেই প্রেমের গানই করিয়াছেন, যে প্রেম চিরন্তন কালের জন্য অসংখ্য বাধাবন্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে মানুষ এবং মানুষের স্বর্গীয় সত্তার ভিতরে, সে একটা চিরন্তন সম্বন্ধ—যাহার ভিতরে আছে উভয়েরই পূর্ণত্ব লাভের একটা পারস্পরিক অপেক্ষা, যে পূর্ণত্বের ভিতরে প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তা এবং বিশ্বসত্তার ভিতরে একটা সম্পূর্ণ মিলন।"

বৈষ্ণব পদাবলী কেবল শুষ্ক তত্ত্বকথা বা দার্শনিক বিচার নয়, কথা ভাব ও সুরের মাধুর্যে এই পদগুলি পরিপূর্ণ। তাই সাধারণ লোকের পক্ষেও মহাজনদের ওই সূক্ষ্ম অনুভূতির আস্বাদন সম্ভব হয়েছে। পদাবলীর প্রত্যক্ষ সরলতা ও তন্ময়তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। বৈষ্ণব মহাজনেরা ছিলেন রূপের সাধক, রসের উপাসক; পদাবলী সেই শাশ্বত রূপ ও রসের প্রকাশ।

বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, মানুষ কেবল মানুষের ভাব দিয়েই ভগবানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের অলভ্য ও অপরিমেয় হলেও শ্রীকৃষ্ণের মানুযোচিত অথচ মানুষের নাগালের অতীত রূপ ও রসের আস্বাদন অথবা রসময় উপাসনাই বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহারি স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারি মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত

বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ওই ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিযাছে। যখন দেখিযাছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিযতম প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।" এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি বৈষ্ণব ধর্মের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সাধনার বিশেষ তাৎপর্যটি প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কবির নিজেরও মানস-স্বীকৃতি আছে বলে মনে হয়।

কবির কাছেও এই দেবতার সুন্দরতম মধুরতম বিচিত্রতম প্রকাশ হয়েছে সসীম মানুষের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে। তাই মানুষের খণ্ড ব্যক্তি-পুরুষের সঙ্গে সেই অখণ্ড পরম-পুরুষের রয়েছে একটি নিবিড়তম রসসংযোগ, তাই গভীর প্রেম। বৈষ্ণব কবিরা এক পরম প্রেমিকের কথা বলেছেন, যে প্রেমময়ের স্পর্শ আমরা আমাদের সকল প্রেমসম্বন্ধের ভিতর দিযে নিত্য অনুভব করি।

৪

প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, ষড়ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে রসমাধুর্যে আপ্লুত ও গভীর ভাবকল্পনায় নিমগ্ন করেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে কবি চিরসুন্দরের অঙ্গদ্যুতি, তাঁরই অখণ্ড আদি রূপের সত্তা দেখেছেন। প্রকৃতি ও মানবের সমস্ত খণ্ড-সৌন্দর্যের পশ্চাতে কবি অলৌকিক অখণ্ড সৌন্দর্য দেখেছেন, খণ্ডের মধ্যে পূর্ণকে উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য, তা সৃষ্টির মূলীভূত আনন্দের ব্যক্ত রূপ। কবির এই অনুভূতির সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের ভাবসাদৃশ্য দেখা যায়। বৈষ্ণব কবির বর্ণনা—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা অমল কমল দল খলই ॥

যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥

পদকর্তা গোবিন্দদাস রাধার রূপের লাবণ্যদ্যুতিটুকু রেখে স্থূলাংশ গোপন করেছেন। এই বর্ণনা কামনাঘন নয়, ভাবঘন। এই ভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিকে অতিক্রম করে বিশ্বপ্রকৃতিকে সৌন্দর্যময় করে তোলে। রাধা এখানে নিখিল সৌন্দর্যের প্রতীক।

বিদ্যাপতির পদে দেখা যায়, কবি রাধার রূপবর্ণনায় প্রকৃতিকে কোথাও বাদ দেন নি। শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে কবি বলিয়েছেন—

জঁহা জঁহা পদযুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরল অপরুব গোরি।
পইঠল হিয় মাঁহ মোরি॥
জঁহা জঁহা নয়ন বিকাশ।
তহিঁ তহিঁ কমল পরকাস॥
জঁহা জঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ অমিয় বিকার॥
জঁহা জহা কুটিল কটাখ।
ততহি মদন সব লাখ॥

এই পদগুলি পড়তে পড়তে আমাদের কবির 'কড়ি ও কোমলে'র "চরণ" কবিতাটি মনে পড়ে। কবি লিখেছেন—

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।

প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়।
যৌবনসঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে—
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল॥

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যে একটি নিবিড় রসসংযোগ আছে তা কোন মতেই ভোলা যায় না। বিশেষ করে বর্ষা ঋতুর চিরন্তন বিরহ-বাণী কবির কাব্যে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-কাব্যের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অত্যন্ত বেশী লক্ষ্য করা যায়। এ কথা বলা চলে যে, বর্ষা সম্বন্ধে কবির এমন কোন গান না কবিতা নেই যার মধ্যে কালিদাসের অথবা বৈষ্ণব কবিদের ভাবধারার ছায়াপাত না হয়েছে। বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ অথবা বারিবর্ষণ দেখলে কবির মনে পড়ে যায়—

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ,
শ্যামল তমালতল নীল যমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।
এ ভরা ভাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়—
বিজন যমুনাকূলে বিকসিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।

ভরা বাদল দিনে কবির মনে বৃন্দাবনের বিরহব্যথা ঘনিয়ে ওঠে—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

বিদ্যাপতির মত কবিরও "বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া"। জ্ঞানদাসের "রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন" পদটি কবির চিত্ত অধিকার করেছিল। তিনি লিখেছেন, "অন্ধকার বাদলারাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরষে।

পালঙ্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিঁদ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝা ঝিনিক বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে হয়ত কবির চোখের কাছে ছিল কোন একটি বালা। ভালবাসার কুঁড়িধরা তার মন। মুখচোরা সেই মেয়ে। চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাওন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন আজও সমানই।

জ্ঞানদাসের এই পদটির ভাবসাদৃশ্য নিয়ে কবি লিখেছেন—

যখন নিশীথে গার্জছে দেয়া, ঝিনি ঝিনি বারি বর্ষে.
মনে মনে ভাবি কোন্ পালঙ্কে কে নিদ্রা যায় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর কবি কাব্যের রঙ্গে।
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি বিগলিত চীর অঙ্গে।

৫

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কবি একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের রূপরসসম্ভোগী। নানা রসের ক্ষুধা নানা বৈচিত্র্যের ক্ষুধা কবিকে বিচিত্র পথে চালিত করেছে। বাস্তবকে কবি কোনদিনই ত্যাগ করবার বা অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আকর্ষণ এবং বন্ধনের মধ্যেই তিনি মুক্তির সাধনা করেছেন। তাই কবি বলেছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
... ... ...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

কবির প্রেম দেহকে বা ইন্দ্রিয়জ প্রেমকে উপেক্ষা করে নি। দেহের মায়ায় কবি আবদ্ধ। নরনারীর পূর্ববাগ, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ সব কিছুকেই কবি সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কবির প্রেম দেহের সীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, সে প্রেম অন্তরের ভিতর দিয়ে দেহের মিলনকে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছে।

চণ্ডীদাস এই দেহোত্তীর্ণ প্রেমের কবি। দেহজ রূপের বর্ণনা তাঁর পদে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তা কামনালিপ্ত নয়। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাস রাধার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

চণ্ডীদাসে কয় মুরতি সে নয়
বধিতে নাগর জনে,
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গঠিল বুঝি অনুমানে।

চণ্ডীদাসের পদে "মুরতি"র বর্ণনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাকে কবি কোনদিনই প্রাধান্য দেন নি, বার বারই বলেছেন—"মুরতি সে নয়", সে যেন বিধাতার "অনুমানে" গড়া ভাবদেহ। পথে রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সাক্ষাতের পর উভয়ের মনের যে অবস্থা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে কবি বলছেন—

অবশপরশ নয়ানে নয়ন
হেরিলা নাগরী পানে।
নাগরী নাগরে হৃদয়ের 'পরে
বাঁধিল সে দুই জনে॥
কেবল দরশ হইল হরষ
নয়ানে নয়ানে খেলা,
বচনে মিলিস হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা।
বৃকভানুসুতা চরণ হইতে
নিরীক্ষণ করে চূড়া,
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাড়া।
মনে মনে বন ফুল তুলি রাধে
পূজল চরণ দুই,
লহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই।

চণ্ডীদাসের পদে সম্ভোগের বিশেষ স্থান নেই। সম্ভোগের মাদকতা তাঁর অন্তরে রসাভাস ঘটায়, তাই তাঁর পদে মিলনের মধ্যেও বেদনার সুর বাজে "দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" পরিপূর্ণ মিলনেও অশ্রু ঝরে, সবটুকু পেয়েও অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধেই থাকে। এ মিলন কি তবে বস্তুজগতে সম্ভব নয়? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে ?

রাধা স্বপ্নে তাঁর বঁধুর সঙ্গলাভ করেছেন, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে আবার সেই হতাশা।

পরানবঁধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র পাশে,
নাসার বেসর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।
পরশ করিতে রস উপজিল জাগিয়া হইনু হারা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মানসমিলনের কথা নানাভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। যে প্রেম নয়নরাগে জন্মলাভ করেছে, যে প্রেম "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল", সে প্রেম বারেবারেই ভাবলোকের দেহাতীত প্রেমে পরিণত হতে কিছুমাত্র বাধা পায় নি। চণ্ডীদাস বলেছেন—

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

এই প্রেম দেহজ কামনা-বাসনার অনেক উর্ধ্বে। জীবনের যে অধ্যায়টিতে আসঙ্গলিপ্সা সব থেকে বেশী, যখন এক মুহূর্ত বিচ্ছেদ সহ্য হয় না, "নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি", তখনও—

হাসিয়ে হাসিয়ে মুখ নিরখিয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিলাইতে
পথের নিকটে রয়।

এখানে কায়ার সম্বন্ধ অনেক দূরে, ছায়ার সঙ্গে ছায়ার মিলনেই সুখ। দুইটি হৃদয় যখন নিবিড় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন দেহটাই সর্বস্ব হয়ে ওঠে না। তাই চণ্ডীদাস বলেছেন—

নিতুই নূতন পিরিতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়—
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে না'হি যায়।

প্রেম যখন একবার জাগরিত হয়ে ওঠে তখন পাত্র-পাত্রীর আর প্রয়োজন হয় না। পাত্র-পাত্রী না থাকলেও তা বর্ধিত হতে কিছুমাত্র বাধা পায় না।

এই প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক অনুরাগকে ক্ষয় করে শেষ করে ফেলে না, পরন্তু নিত্য তাদের মনে নব নব প্রেমের উন্মাদনা জোগায়।

বলরাম দাস বলেছেন—"তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।" রবীন্দ্রনাথ এর সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রিয় বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু, তাহাকে কে যেন বাহির করিয়া আনিয়াছে। সেইজন্য তাহাকে ভিতরে ফিরিয়া পাইবার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা।" এই আকাঙ্ক্ষাকেই বৈষ্ণব কবিরা দেহজ আকর্ষণের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই আকাঙ্ক্ষা ও দেহী আকর্ষণের মধ্যে অনুভবগত সাম্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও আমরা সম্ভোগ-কাব্য বলতে পারি না, এ কাব্য বিপ্রলম্ভের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কবির 'কড়ি ও কোমল' কাব্যকে অনেকে সম্ভোগ-কাব্য বলে থাকেন, কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়, তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। জ্ঞানদাসের

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

পদটি কবিকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই 'কড়ি ও কোমলে' আমরা পাই—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন,
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে,
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।

এইটুকুই এই কাব্যের সবটুকু পরিচয় নয়। এই কাব্যে নারীর দেহ-সৌন্দর্যকে কবি অপরূপ ভাবে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু তাকেই একান্ত করে দেখেন নি, দেহের মধ্য দিয়ে দেহাতীত সৌন্দর্যে উপনীত হয়েছেন।

'মানসী' কাব্যে আমরা দেখি কবি "মুরতি স্রোত" থেকে বাঁচতে চেয়েছেন। পার্থিব কামনা-বাসনাকে হরিপ্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে কবি সুরদাস চরিতার্থ হতে চেয়েছেন—

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি।
হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি। ("সুরদাসের প্রার্থনা")

এই প্রেমের ব্যাখ্যা হয় না। কারণ "পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নোতন হোয়।" রবীন্দ্রনাথ এই অনুভবকে উপলব্ধি করে বলেছেন, "যখন দেখি আমার মধ্যকার অচেনাকে, তখন আপন অনুভবের তল খুঁজে পাই নে। সেই অনুভব 'তিলে তিলে নোতন হোয়'।"

রবীন্দ্র-প্রেমসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নরনারীর প্রেমকে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। কবি প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো? ('গীতালি')

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নরনারীর আন্তরসত্তার এই যোগাযোগ উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যাপতির এই বিখ্যাত পদটি প্রত্যেক বিরহী-বিরহিণীর প্রাণের কথা—

কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গে ভায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

কবিরও "এমন ঘনঘোর বরিষা"য় তাকে ছাড়া দিনরাত্রি কাটতে চায় না। সেই একটি মাত্র জনকে জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথাটি বলবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায়। ('মানসী')

রবীন্দ্র-কাব্যে যে ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি আছে বৈষ্ণবপদে তার কিছু অভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যেও পূর্বরাগ মান মিলন বিরহ অভিসার সবই আছে, কিন্তু তা—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

রবীন্দ্র-প্রেমও পরকীয়া প্রেম। এখানে নায়ক বহুবল্লভ নয়, বিশ্বপ্রণয়ী। বৈষ্ণব সাহিত্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে রাধার প্রেম বিকশিত

হয়েছে এবং মহামিলনেই সেই প্রেম সার্থক হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেয়সী তার প্রিয়তমকে অনুসন্ধান করেছে সর্বমানবের মধ্যে, সমগ্র বিশ্বে। রাধার সাধনা ভাব-সম্মিলনে চিরশান্তি লাভ করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চির-রহস্যময়ীর পূজারী, অন্বেষণই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। "পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।" কবি তাঁর প্রিয়জনকে নাগালের মধ্যে পেতে চান না, কারণ তা হলেই যে সব অন্বেষণ ফুরিয়ে যাবে। তাই তাঁর ঈপ্সিত ধরা দিয়েও ধরা দেন না, জেনেও তাঁকে জানা যায় না। তাই ক্ষণে ক্ষণে মিলন, আবার ক্ষণে ক্ষণে বিরহ। কবি বিরহের মধ্যে মিলন খোঁজেন, মিলনের মধ্যে বিরহ। এ খোঁজার শেষ নেই।

বৈষ্ণব পদে বিরহানলে জর্জরিত হওয়া আছে, সেখানে আমরা দেখি রাধার "পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।" রাধা বলেছেন—

এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।

কৃষ্ণবিরহে রাধার—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরি।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥

রবীন্দ্র-কাব্যে বিরহ-বেদনার তীব্রতা আছে কিন্তু অপূর্ণতার হাহাকার নেই। কবির "পথ চাওয়াতেই আনন্দ।" তাই কবি অশ্রুসজল হয়েও পূর্ণ হৃদয়ে বলেছেন—

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই
পথ চাই
সেও মনে ভাল লাগে। ('গীতাঞ্জলি')

দুঃখ-বেদনা-আঘাতের মধ্য দিয়েই কবি তাঁর প্রিয়তমকে চিনেছেন। রাধার মত আক্ষেপ করে কবি নিজের জীবনকে ধিক্কৃত করেন নি।

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে—('গীতালি')

এ ভাব বৈষ্ণবিক ভাব নয়। বৈষ্ণব সাধকের তৃপ্তি মহামিলনে, কবির তৃপ্তি মিলনের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষায়। বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মিলনের পাত্রটি বার বার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ মিলন বৈষ্ণবের মহামিলন

নয় বা ব্রহ্মসাযুজ্যলাভও নয়। এ কবিরই নিজস্ব ভাব-সম্মিলন। রবীন্দ্রনাথের মিলনরীতির বৈশিষ্ট্য এই—

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ।
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা। ('গীতালি')

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য—একান্ত তন্ময়তা, প্রেমের অবিচলিত একাগ্রতা, আত্মনিবেদনের জন্য গভীর আকুলতা। এই বিশ্ববিলোপ তন্ময়তা মনকে সহজেই অপার্থিব ভিত্তিভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেয়। পূর্বরাগ মান মিলন প্রভৃতি ভাবাত্মক প্রত্যেকটি পদে বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান ভাব প্রেমের নিবিড়তা ও একান্ত তন্ময়তা। সর্ব-আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনে নিজেকে সার্থক করে তোলাই যেন একমাত্র কাম্য। এখানে রাধাকৃষ্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন একবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখানে রাধা—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাব হি বিসরল অপন গুণ অনুধাই।

রাধা বলছেন, শুধু মৃত্যুকালে নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমাকেই প্রাণ-প্রিয় বলে জানি। শুধু এ জন্মে নয়, যতবার পৃথিবীতে যাওয়া-আসা করব, তুমিই আমার একমাত্র প্রিয় থেকো।

তোমার চরণে আমার পরানে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

কতভাবে রাধা নিজেকে সমর্পণ করছেন কিন্তু তবুও যেন তৃপ্তি নেই। রাধা বলছেন—

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহমন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥

পিরিতি রশেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি,
মনে নাহি আন ভায়॥

'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', গীতালি' প্রভৃতি গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছের ভিতর রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় সব থেকে বেশী। বৈষ্ণব সাধকের "তিল-তুলসী দিয়া" আত্মনিবেদনের আর্তি, প্রেমের উৎকণ্ঠা, একাগ্রতা ও ব্যাকুলতা সবই এতে দৃষ্ট হয়।

প্রাণ চায় সকল বাধা অতিক্রম করে প্রিয়তম কাছে আসুক, কিন্তু পথের দুঃখ স্মরণ করে বেদনায় বুক ভরে যায়—

এ পথ বেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে, কতই ধুলা লাগে গায়ে—
মরি লাজে, সকাল-সাঁজে।

প্রিয়-অভিসারের বেদনায় বৈষ্ণব কবিরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলা বাটে।
আঙিনার কোণে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরান ফাটে।

যে আমিত্ব-বিসর্জন বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথা, তা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। মনে হয় এই জন্যই যেন এই কবিতাগুলি অলঙ্কারভারমুক্ত। নিজেকে সজ্জিত করবার আর কোন প্রয়োজন নেই, নির্মুক্ত হয়ে "দাসী হঁয়া নিশিব আপনা" যেন এমনি একটি ভাব।

কবিহৃদয়ের করুণ আকুতি এই কবিতাটিতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—

কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চির জনম এমন করে ভুলিও নাক,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধুসর হব। ('গীতাঞ্জলি')

বৈষ্ণবিক দৈন্য ও আকিঞ্চন এই কবিতাটির মূল সুর—

নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন নয়নজলে।
একা আমি অহংকারের উচ্চ অচলে—
পাষাণ-আসন ধুলায় লুটাও ভাঙো সবলে। (ঐ)

সর্ব-আমিত্ব বিসর্জনের এমন একান্ত নিবিড় আকূতি—এ একমাত্র বৈষ্ণব সাধনাতেই সুলভ।

লীলাময়ের অনন্ত লীলায় কবি পরম বিশ্বাসী, কিন্তু বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় ও দৈন্য সহকারে তিনি বলছেন—

অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে,
আমি পরম অবিশ্বাসী,
এ পাপমুখে সাজে না যে
তোমায় আমি ভালবাসি।
গুণের অভিমানে মেতে
আর চাহি না আদর পেতে ;
কঠিন ধুলায় বসে এবার
চরণসেবার অভিলাষী।

বৈষ্ণব সাধকদের এই বিশ্বাসকে কবি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন যে, যদি একমাত্র তাঁকেই প্রেম নিবেদন করতে হয় তবে শ্রীরাধার মতই ধন জন মান যশ, লজ্জা ভয়, সমাজ-সংস্কার, গৃহ-পরিজন সব কিছু থেকে নিঃশঙ্ক হয়ে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কোন বন্ধনই যেন তাঁকে বাঁধবার পক্ষে যথেষ্ট না হয়। কবির মনের এই ভাব বহু কবিতাতেই ব্যক্ত হয়েছে।

শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার,
একেবারে সকল পর্দা ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখ তার ঘরের আড়াল না রাখ তার ধন—
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর আকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান, লজ্জা শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।

বৈষ্ণব সাধকহৃদয়ের নিবিড়তা রবীন্দ্র-কাব্যেও উপলব্ধি করা যায়—

না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে। ('গীতিমাল্য')

এ কথা বৈষ্ণব প্রেমিকেরই কথা।

৮

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভক্তের মত নামব্রহ্মকেও স্বীকার করেছেন। কেবলমাত্র ভগবানের নাম জপের মধ্যেও যে পরম সার্থকতা আছে তা কবি বৈষ্ণব কবিদের

মতই উপলব্ধি করেছেন। সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের নামটি যখন রাধার কানে প্রবেশ করেছিল, সেদিন রাধার সারা দেহমন আকুল হয়ে উঠেছিল। সেদিন থেকে সেই নাম ব্যতীত আর কিছুই রাধাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

নামের মধ্যে যে কী মধু আছে তা বৈষ্ণব পদে বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গোবিন্দদাস বলেছেন—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপুরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ।
সজনী, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমনমাতল
না শুনে ধরম নব লেশ।

রাধার ভাবে ভাবিত হয়ে আমাদের কবিও আকাঙ্ক্ষা করেন—

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা।

সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফলে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু। ('গীতিমাল্য')

কবির "জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে" যিনি বাসা বেঁধে রয়েছেন তিনি উপনিষদের ব্রহ্ম নন, বৈষ্ণবদেরই সেই চিরন্তন বঁধুটি।

নানা ছলে নানা নামে জীবনের সুখে দুঃখে নানা ভাবে তাঁকে ডেকেও যেন তৃপ্তি নেই,—শুধু অকারণ পুলকে তনুমন ভরে যায়—

তোমারি নাম বলব নানা ছলে—
বলব একা বসে, আপন মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম। (ঐ)

এই ডাকার মধ্যে কত যে আকুলতা, কত যে আনন্দ আছে সেই ভাবটি ব্যক্ত করে কবি বলেছেন—

যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া
সেও আমার পাওয়া,
তাই তো পরান পরান-পানে
হাত বাড়িয়ে মাগে।

ভগবান রাজাধিরাজ হয়েও ভিক্ষা চান, তিনি দীনের হতেও দান। বংশীধ্বনি-শ্রবণে পরান পাগল হওয়া, এক তরীতে ভেসে যাওয়া, নীল যমুনার জলে অবগাহন—এ সমস্তই বৈষ্ণব ভাবের কথা। কবি একটি কবিতায় লিখেছেন—

ঝুলি হতে দিলাম তুলে একটি ছোট কণা।
যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি—এ কি,
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি!
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে?

কবির এই পদটি ঘনশ্যাম দাসের একটি পদ স্মরণ করিয়ে দেয়—

এত কহি ফলাহারী ফল দিল কর ভরি
প্রেমভরে গদগদ চিত।
কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে সাথে
আসি নিজ গৃহ উপনীত।
ফল দেখি যশোমতী আনন্দে না জানে কতি
খাওয়াইয়া প্রেমসুখে ভাসে।
ধন্য সেই ফলাহারী ফলে পাইল নন্দহরি
কহে কিছু ঘনশ্যাম দাসে।
ডালা হইল রতনে পূরিত ফলাহারী সবিস্ময়-চিত—
আপনা আপনি করে খেদ, মনে মনে ভাবে নিরবেদ।

৯

অন্যদিকে বংশীবদনের "বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি?" কিংবা জ্ঞানদাসের "আইস বৈস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে" প্রভৃতি পদের ছায়া আমরা রবীন্দ্রনাথের "পসারিণী" কবিতায় দেখতে পাই।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ভাষা ছন্দ অলঙ্কার রচনাশৈলী প্রভৃতি বিষয়ে কবির মনে যে একটি বিশেষ দরদ ও শ্রদ্ধা ছিল তা কবির নিজের উক্তি দিয়ে প্রমাণিত করা যায়। কবি বলেছেন, "প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, যাহা পূর্বাপর তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল! অলঙ্কারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল। ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল! বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নয়, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নয়, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।

প্রকাশ করিবার এত আনন্দ, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতী সঙ্গীত থৈ পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত-প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন—এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়া ছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

"ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণব যুগে। এই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল।"

বাংলার শক্তি-ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের তুলনা করে কবি এক জায়গায় বলেছেন—"শক্তি-পূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয় সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণব ধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—যে শক্তি বলরূপিণী নয়, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। ভগবান বল ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই. তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে—এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্ত ধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। লীলায় যে দয়া পায় তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে সকলেরই নিত্য দাবী। শাক্ত ধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

কবি আরও লিখেছেন—"শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালের অনুগামী অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে সকল আকস্মিক উত্থান-পতন লোককে প্রবল বেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্ত ধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। বৈষ্ণব ধর্ম একভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল।"

বৈষ্ণব ভাবদর্শনের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বহু নিদর্শন কবির কাব্যে ও আলোচনায় ছড়িয়ে আছে।

এ কথা ঠিক যে তাঁর রচনার মধ্যে এমন অনেক ভাবাদর্শ আছে যা বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিকূল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে, বৈষ্ণব আদর্শ কবিকে বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত করেছিল ও প্রেরণা জুগিয়েছিল।

১০

শান্ত রসের কবি বৈষ্ণবদের ভাবোদ্বেলতাকে কোন দিনই স্বীকৃতিদান করতে পারেন নি, পরন্তু এই উচ্ছ্বাসের সমালোচনাই তিনি করেছেন। কবি বলেছেন—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেনভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ॥

... ... ..

যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভচেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন॥
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ, অমত্ত, গম্ভীর॥ ('নৈবেদ্য')

এই প্রার্থনা বৈষ্ণবের নয়, বৈদান্তিকেরও নয়, এ ভক্তি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনার ধন। "উপনিষদের ঐশ্বর্যে তাহা রূপবান, বৈষ্ণবের মাধুর্যে তাহা উজ্জ্বল এবং সর্ব-মানবতার আদর্শে তাহা সম্পূর্ণ।" রবীন্দ্রনাথ মুক্তিসাধক নন, তিনি ভক্তিসাধক। তাই তিনি বলেছেন—

তোমার কাছে চাই নে আমি অবসর—
আমি গান শোনাব গানের পর। ('গীতালি')

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীককে তিনি গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তার ভিতরকার সর্বজনীন পরম সত্যকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে একদিন বলেছিলেন, "না জানিয়া নিজেরই অজ্ঞাতসারে এমন সব কথা আপনি বলিয়াছেন যাহা হইল বৈষ্ণবদের নিগূঢ়তম কথা। ইহাতেই বুঝা যায়, ভারতের সেই প্রাচীন রস-সাধনার ধারার সঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে আপনার কি গভীর যোগ, ভারতীয় সাধনার নিত্য ধারাই আপনার মধ্যে প্রবাহিত।"

রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য জীবনে ভারতের বিচিত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা এসে মিলিত হয়েছে। তিনি সর্ব ধর্মের উপাসক ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মূল আদর্শ তাঁকে যেমন অনুপ্রাণিত করেছিল তেমনি অন্য ধর্মের মহৎ আদর্শও তাঁকে কম শ্রদ্ধান্বিত করে নি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক।

# রবীন্দ্র কাব্যে সৌন্দর্যানুভূতি

রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যের অনুভূতি নিছক একটা ভাববিলাস বা একটা বস্তুহীন ভাবগত কামনা মাত্র নয়। সৌন্দর্যের মূল সম্বন্ধে তাঁর মনে একটি বিশেষ ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির অন্তরালে এক মহান সত্য-সুন্দরকে উপলব্ধি করেছেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই উপনিষদের ঋষির এই বাণী তাঁর জীবনের মর্মমূলে বাসা বেঁধেছিল যে, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—যা-কিছু প্রকাশিত সবই তাঁর আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। কবির জীবনের এ এক গভীরতম উপলব্ধি যে, রূপজগতে যত কিছু খণ্ড-সৌন্দর্যের প্রকাশ সবই সেই আনন্দরূপ অমৃতরূপের অভিব্যক্তি, সবই অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীক এবং যেখানে যে রস পরিবেষিত হচ্ছে সবই রসস্বরূপেরই রস। রবীন্দ্র-কাব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই অনুভূতি জীবনে ও কাব্যে এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য লাভ করেছে। এই গভীর উপলব্ধি তাঁর কাব্য-প্রেরণার মূলীভূত উৎস।

কবি উপলব্ধি করেছেন, প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য প্রকাশিত তা চির-সুন্দরেরই অঙ্গদ্যুতি, এবং ষড়ঋতুর যে বিচিত্র লীলা-উৎসব, তা সেই লীলাময়েরই লীলা মাত্র। কবি এক জায়গায় বলেছেন—"মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি সেই আশ্চর্য।" দুটি চোখ ভরে কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন এবং এর সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করেছেন।

রূপলোকের ক্ষণিকতা, অসম্পূর্ণতা কবি পুরোমাত্রায় ভোগ করেছেন, কিন্তু এর পটভূমিকায় বৃহত্তর ভাবজগৎ বর্তমান থাকায় রূপজগতের অসম্পূর্ণতার অন্তরালে এক অনন্ত সৌন্দর্যজগতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের শত বিচিত্র প্রকাশ ও মানবদেহ-মনের বিচিত্র রূপ ও রসের অভিব্যক্তি একটি অখণ্ড সৌন্দর্যরূপে কবি তাঁর অন্তরে অনুভব করেছেন। এই অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতি কবির চিত্তে এক অলৌকিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিশ্বচেতনাই কবির সমস্ত কাব্যের মূল প্রেরণা।

অধ্যাত্ম-জীবনে এসে এই সৌন্দর্যানুভূতি এক অপূর্ব ভাবগরিমা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যায়ের কাব্যে দেখা যায় যে, তিনি খণ্ড রূপ ও রসের পথেই অগ্রসর হয়েছেন। 'মানসী'র যুগে কবি খণ্ড-সৌন্দর্যের আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন, তারপর 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী'র যুগে অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতি কবিকে এক অরূপ লোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। তখন তিনি জগৎ ও জীবনের মধ্যে অভিব্যক্ত সৌন্দর্যকে অখণ্ড ভাবে দেখেছেন। ক্রমশ এই উপলব্ধি দার্শনিকের চিন্তা ও ধ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে।

কবি সৌন্দর্যের উপাসক, সৌন্দর্যসম্ভোগে তৃপ্ত। 'কড়ি ও কোমলে' যে সৌন্দর্যসম্ভোগ হয়েছে তাতে কবি তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি। কী এক অনির্দিষ্ট ব্যথায় কবিচিত্ত কাতর হয়ে উঠেছে। কারণ কবি অনুভব করেছেন যে, ভোগবাসনা যখন একান্ত উদগ্র হয়ে ওঠে তখন সৌন্দর্যের সঙ্গে, বৃন্তের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। সৌন্দর্যের সঙ্গে ভোগবাসনা অচ্ছেদ্য এ কথা ঠিক, কিন্তু ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতার অতীত একটি অসীম সৌন্দর্য আছে। সেই রূপটি দেখতে পেলেই ভোগের লালসা আপনি ক্ষয় হয়ে যায়। কবি এক জায়গায় বলেছেন—"যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে, কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত। কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।"

'মানসী'র যুগে কবি বিশ্বসৌন্দর্যকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, এতদিন খণ্ড সৌন্দর্য ভোগ করে কবির দেহ-মন ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। কবিচিত্ত আর্তনাদ করে বলেছে—আর মূর্তি নয়, ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি নয়, আকারের অতীত যে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য আছে তারই আস্বাদ পেতে চাই। "পারি নে ভাসিতে কেবলি মুরতিস্রোতে"—অতএব "হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।" 'কড়ি ও কোমলে'র ভোগ-বাসনা থেকে কবির "নিষ্ক্রমণ" হয়েছে। এখন কবির প্রিয়া আর একান্ত কবির নয়, তাকে কবি মানস-প্রিয়া করে এক অনন্ত সৌন্দর্যময়ী নারীরূপে কল্পনা করতে শুরু করেছেন। তাঁর সর্বব্যাপিনী মূর্তিই কবির চিন্তা ও কর্মের একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তি। যে নারী সৌন্দর্যের আদিরূপ, চিরসৌন্দর্যলোকে যার বাস, যে চিরন্তন প্রেয়সী, সে বিশ্বের—সে অনন্তের।

'সোনার তরী'তে এসে কবির এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী খুলে গেল। এতদিন কবি বিশ্বসৌন্দর্যকে কল্পনার লীলাজালে আবদ্ধ করে দেখেছেন, এক আদর্শ লোকে এর স্থান নির্দেশ করেছেন; কিন্তু আজ প্রকৃতি ও মানবের অন্তর্নিহিত যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের স্পর্শ যেন কবি উপলব্ধি করতে পারলেন। এই যুগে কবি আবিষ্কার করলেন যে, আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেম কোন কল্পজগতে নেই, তার প্রকাশ প্রতিদিনের জীবনে প্রতিক্ষণেই হচ্ছে, এই বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যেই তার নিত্য প্রকাশ; কিন্তু মানুষ ভোগের আয়োজনে এত ব্যস্ত থাকে যে কখন সেই সোনালী মুহূর্ত এসে বৃথাই ফিরে যায় তার সন্ধান রাখে না। এই সময়ে সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ কবির কাছে উদ্‌ঘাটিত হল এবং তাঁর ভাবজীবনে এক সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল।

'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতি এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তায় ও ভাবৈশ্বর্যে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। 'সোনার তরী'তে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছে তারই পূজারতি এই 'চিত্রা' কাব্যে। 'মানসী' কাব্যের "মানসসুন্দরী", যাকে কবি আদি সৌন্দর্যরূপিণী ভাবে কল্পনা করেছেন, সেই মূল সৌন্দর্যকে নানা রূপ ও রসে এই অধ্যায়ে অনুভব করেছেন।

'চিত্রা'র প্রথম কবিতাটি [illegible]। বিশ্বসোহাগিনী বিশ্বব্যাপিনী ও অনন্তের অন্তরশায়িনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্বরূপ বর্ণনা ও পূজাবন্দনা। সৌন্দর্যের আদিরূপ বস্তু-নিরপেক্ষ, ইন্দ্রিয়গত ভোগের অতীত ভাবময় একটি অনুপ্রেরণা। সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ উপাসক কবি সেই মূল সৌন্দর্যকে নানা রূপে ও রসে 'চিত্রা' কাব্যে অনুভব করেছেন। বিশ্বগত-বিচিত্র সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে সবই সেই চিরন্তন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অভিব্যক্তি। সেই আদি সৌন্দর্য বহির্জগতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, আবার সেই সৌন্দর্যই মনের মধ্যে এক অচঞ্চল ভাবময় রূপে বিরাজিত। কবির সমস্ত চিত্ত জয় করে সেই মহিমময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী বিরাজ করছেন এবং কবি মুগ্ধচিত্তে তাঁর পূজায় একান্ত নিমগ্ন।

'চিত্রা'র "উর্বশী" ও "বিজয়িনী" কবিতায় কবি চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করেছেন। বহির্জগতে প্রকাশিত সমগ্র সৌন্দর্যের সমষ্টিকে উর্বশীরূপে কল্পনা করার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। কবির কাছে সৌন্দর্য একটি সত্তা মাত্র এবং সৌন্দর্যভোগের তৃষ্ণা মানবচিত্তে চিরদিন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রয়োজনের অতীত,

ভোগবাসনার ঊর্ধ্বে। তাই তাকে ভোগের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে গেলেই হারাতে হয়। "উর্বশী" কবিতায় এই ভাবটিই মূল কথা।

"উর্বশী"তে কবি মোহিনী নারীর দেহবিচ্যুত নির্বস্তুক সৌন্দর্যকে সমস্ত প্রয়োজন ও মানব-সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে তুলে পূজার সামগ্রী করে তুলেছেন। উর্বশীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন—"উর্বশী যে কি, কোনো ইংরেজী তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্য মাত্রই এব্‌স্‌ট্র্যাক্‌ট্‌—সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা, যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য।...উর্বশী কে? সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।

"দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপসৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহসৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে। সে যেন চিরযৌবনের পানে রূপের অমৃত, তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।" এই নারী কন্যা নয় বধূ নয় মাতা নয়। অযোনিসম্ভবা এই নারী মানুষের সকল বন্ধনের ঊর্ধ্বে একটি সত্তাবিশেষ। সে বস্তু-নিরপেক্ষ, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের নির্যাস। তার শৈশব নেই কৈশোর নেই বার্ধক্য নেই, সে অনন্তযৌবনা। ইনি বন্ধনমুক্ত হয়ে বিশ্বকে কেবল যৌবনচাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত করেন—

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,

... ... ... ...

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।

কবি দেখেছেন সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমের মূলে উর্বশীর এই অনুপ্রেরণা।

বিশ্বের অন্তরশায়িনী এই মোহিনী মাধুরীকে বাহুবন্ধনের মধ্যে পাওয়ার জন্য মানুষ অধীর হয়, কিন্তু

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী,

... ... ... ...

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে।

একদিন পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলন হবেই।

"বিজয়িনী" কবিতায়ও এই ভাবটি প্রকাশিত। সৌন্দর্যের সঙ্গে ভোগস্পৃহা জড়িত, কিন্তু মানবদেহের যে একটি প্রাণময় মনোময় অপূর্ব সৌন্দর্য আছে, তার পরম বিস্মিত প্রকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে দেহের মোহ দূর হয়ে যায়, সেই পবিত্র শাশ্বত সৌন্দর্যকে পূজা করবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই যে মদনের কাজই হল কামনার ইন্ধন যোগানো, সেই মদনও এই আদি সৌন্দর্য-রূপিণীর কাছে পরাজিত। সমস্ত ভোগবাসনা ত্যাগ করে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে নতশির—

নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

এই যে সৌন্দর্য, যার সত্তা কবি বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে উপলব্ধি করেছেন, তাকেই তিনি আহ্বান করেছেন "জ্যোৎস্না রাতে"। কবির ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত করবার জন্যে তিনি সুন্দরীকে নিস্তব্ধ নিদ্রালু রাত্রে তাঁর নিজন নিরালা শিয়রতলে এসে দাঁড়াতে বলেছেন—

আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে। অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্তি! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়,

... ... ... ...

আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেল, ছিন্ন করে ফেল ওই—
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।

কোন মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

সৌন্দর্যসভাব বহির্দ্বাবে বসে কবিব মনে পূর্বস্মৃতিব চেতনা জাগছে এবং এক অব্যক্ত বেদনা সারা অন্তবকে মথিত করে তুলেছে। কবিব মনে হচ্ছে, এই সৌন্দর্যসভায় আমিও একদিন ছিলাম কিন্তু আজ সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। মিলনেব আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ মিলিত হতে পারছি না, তাই বিচ্ছেদেব বিলাপবাণি ফেনিল হয়ে উঠছে, "উন্মাদ কবিছে হিয়া অপূব বিবহে।" বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মীব কাছে কবি করুণ কাকুতি জানাচ্ছেন—

খোল দ্বার খোল দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা,
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

যে সৌন্দর্যময়ীকে লাভ করবার জন্য কবি পাগল, ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, "পূর্ণিমা রাতে" তিনি নিজেই অভিসারিকার বেশে কবির কাছে ধরা দিতে এলেন। কবি মুগ্ধ, বিস্মিত। অপার আনন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন—

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্যে উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে?

"আবেদন" কবিতায় কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ভৃত্য হবার জন্য আকূতি জানাচ্ছেন। দেবীর বহু ভৃত্য বহু কাজ নিয়ে চলে গেল, কবি সর্বশেষে দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করলেন যে তিনি শুধু বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে মাল্য রচনা করবেন। "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" কবিব জীবনেব চরম আদর্শ বিশ্বসৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে সেবা করা। কবির রসপিপাসু চিত্ত চায় সৌন্দর্য লুণ্ঠন করতে। এ সৌন্দর্যের সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন প্রয়োজনের সম্পর্ক

নেই, "the highest aesthetic pleasure is a pleasure without any interest"। এর সার্থকতা ভোগে নয়, শুধু একমাত্র আত্ম-নিবেদনে। তাই দেবী যখন ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন সে কী পুরস্কার চায়, তখন কবি বিনীত কণ্ঠে বললেন যে, যশ মান ধন পার্থিব সম্পদ কিছুই তাঁর চাই না, শুধু এই পুরস্কার পেলেই তিনি সার্থক—

প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
এই পুরস্কার।

এখানে একটা কথা মনে হয় যে, যে সৌন্দর্যচেতনা একটি বস্তু-নিরপেক্ষ বোধ মাত্র, অন্তরের একটা আনন্দানুভূতি মাত্র, কবি তাতে একটি বিশেষ সত্তা আরোপ করে তাঁকেই অনন্তরহস্যময়ী প্রণয়বিধুরা নারীতে পর্যবসিত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেই জীবনদেবতায় উন্নীত করে স্বস্তি লাভ করেছেন। তাই দেখা যায় 'মানসী' কাব্যে কবি যাকে তাঁর "জীবনের প্রথম প্রেয়সী" "ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী" বলেছেন, সেই সৌন্দর্যশশীই পরবর্তী যুগে অন্তর্যামী জীবনদেবতা রূপে দেখা দিয়েছেন। ইনিই কবির অন্তরবাসী সৃষ্টিপ্রেরণা, আবেগ-চাঞ্চল্য, বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতি, ঐক্যানুভূতি—তাঁর জীবনের একমাত্র রস-লক্ষ্মী।

# রবীন্দ্র-কাব্যে সৃষ্টির স্বরূপ

১

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি। বিশ্বকে তিনি ভালবেসেছেন। তাঁর এই ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে কাব্যে তথা সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, জীবনের বিচিত্র প্রকাশে। নিজের প্রেমের আলোকে তিনি দেখেছেন নিখিলের "ধুলায় ধুলায়" সংসারের সর্বত্র প্রেম বিরাজিত, ছোট কণারও দরদ আছে ; জগতের কিছুই তুচ্ছ নয়, সবই মহনীয়—

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।

কবি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, এই পৃথিবীকে যে তাঁর এত ভাল লাগে তার কারণ এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শুধু আজকের নয়, জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই সম্বন্ধ নিত্য-নূতন হয়ে নব নব চেতনার আলোকে এসে দেখা দিচ্ছে। এই পৃথিবী অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার মানুষের মত কবির কাছে চিরন্তন রূপে দেখা দিয়েছে। তাই .কবি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে বসুন্ধরার জন্মের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে আমাদের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান তা বলতে চেষ্টা করেছেন। কেমন করে এই বিশ্বজগৎ গড়ে উঠল এবং কে তার নিয়ামক এ সম্বন্ধে কবির কৌতূহলের সীমা ছিল না, এবং এই গভীর সৃষ্টিরহস্যসন্ধানে কবিচিত্ত সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকত। এই সন্ধান-তৎপরতা কতভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। কৈশোরের 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়সের 'বলাকা', এমন কি তার পরেকারও একাধিক কাব্যে সৃষ্টির প্রাণধর্মের কথা তিনি বলেছেন। সৃষ্টির প্রাণধর্মের রূপ সর্বত্র একভাবে প্রকাশ পায় নি সত্য, কিন্তু সর্বত্রই এর রূপ কোন না কোন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টির প্রাণধর্মের এই লীলা-চাঞ্চল্যকে তিনি কখনও দেখেছেন বিস্ময়ভাববিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে, কখনও দেখেছেন সুমহান আদর্শের ঊর্ধ্বমুখী কল্পনায়। তাই প্রথম থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বলেছেন—

অবজ্ঞা করি নি তোমার মাটির দান,
আমি যে মাটির কাছে ঋণী জানায়েছি বারম্বার।

২

জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মননেরও প্রায় তাই, কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। যাকে জ্ঞানে যুক্তিতে তর্কে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া যায় অনুভূতির সীমাহীন রাজ্যে। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রেম। এমন কোন বস্তু নেই যা প্রেমের সীমায় এসে মিলিত না হয়। এই অনুভূতি কবিকে কাব্যরচনায়, শিল্পীকে রূপরচনায়, সাহিত্যিককে সাহিত্যরচনায় প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণার মূলেও রয়েছে এই অনুভূতির প্রেরণা, প্রকাশের প্রেরণা; কোন রকম তথ্য বা জ্ঞানের প্রেরণা নয়।

কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এক জায়গায় বলেছেন, "আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব নাড়া দিয়াছে।" কে অন্তরের অন্তস্তলে বসে নাড়া দিয়েছে তা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি যিনিই হোন তিনিই যে কবির জীবনের একমাত্র নিয়ামক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কবি রাখেন নি। 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় দেখা যায় যে, একদিন তিনি কলিকাতায় সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ এক অপূর্ব ভাবপ্রবাহ তাঁর সারা অন্তরকে আলোড়িত করে তুলেছিল। তিনি মুহূর্তে অনুভব করলেন—"একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।··· শিশুকাল হইতে চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।···বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইলাম।" সেই সকালবেলায় এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তে তিনি যে প্রত্যয়টি আবিষ্কার করেছিলেন পরবর্তী জীবনে এই একান্ত সত্যবোধটি জীবনের বিচিত্র অনুভূতিতে কত সত্যভাবেই না প্রকাশিত হয়েছে। এই সত্যবোধ দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত নয়, অধ্যাত্মবোধের ফলস্বরূপও নয়, একটি সহজ স্বাভাবিক অনুভূতির ফলেই এই সত্য তিনি লাভ করেছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন, এ "তত্ত্বও নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোনপ্রকার কাজের জিনিসও নয়—তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর কোন বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌণ। কারণ, অন্তরের অন্তস্তলে যে কাজ চলে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তার সকল খবর আসিয়া পৌঁছায় না।" তাই আমরা দেখি তাঁর রচিত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে বহু সুমহান্ সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু তা যত না জ্ঞানমার্গীয় তার থেকে অনেক বেশী হৃদয়মার্গীয়।

৩

চিন্তাশীল অনুভূতিপ্রবণ মানুষের মনেই প্রশ্ন জাগে। তত্ত্বান্বেষী মন নানাভাবে সব কিছুই জানতে চায়, বুঝতে চায়, প্রকাশ করতে চায়। তাই তার অনন্ত প্রশ্ন অনন্ত সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে। মানুষ যুগের পর যুগ সৃষ্টিরহস্য ও বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে চিন্তা, গবেষণা ও কল্পনা করে পরবর্তী যুগের জন্য চিন্তাধারা সঞ্চিত করে গিয়েছে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নানা রকম আখ্যান-উপাখ্যান, উপকথা-রূপকথা, বিজ্ঞানসম্মত কাহিনী প্রচলিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাতসঙ্গীতে' "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" কবিতাটির মধ্যে বিশ্বসৃষ্টিব আদি অন্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন তার মধ্যে পুবাণের কল্পনা ও বিজ্ঞানচিন্তার বেশ সুন্দর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছেন—"আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান সেরে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীব জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালাক পান করেছিলাম, নব-শিশুর মত একটি অন্ধ জীবনেব পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলাম। এই আমার মাটির মাতাকে আমার মস্ত শিকড়গুলি দিযে জড়িয়ে এর স্তনবস পান করেছিলাম। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদেব সেই বহুকালের পরিচব যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

"সমুদ্রেব প্রতি" কবিতাটি পড়লেই মনে হয যে, কবি পৃথিবীব জন্মবহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। "সমুদ্রেব প্রতি" ও "বসুন্ধবা" কবিতা দুটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কল্পনার সমন্বযে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ কবেছে। সমুদ্রের প্রতি কবিতায় কবি নিজের উপলব্ধির কথা বলেছেন এইভাবে—

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে—,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,

আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজ্ঞাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে; লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

"বসুন্ধরা" কবিতাটির মধ্যে অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। এই কবিতায় মাটির সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গিতে কবির এক হয়ে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষার মূলে যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পূর্বজন্মস্মৃতি নিহিত আছে, এখানেও সেই স্মৃতি কবিকে ব্যাকুল করে তুলেছে—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি,
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর,……

জাগে মহাব্যাকুলতা—

মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।

৪

কবির কাছে এই অদৃষ্ট সৃষ্টিধারা নিছক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক কথা নয়, বিশেষ কোন মতবাদও নয়। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, চিরপ্রবহমাণ প্রাণধারা নিত্য নব নব রূপে এই সৃষ্টিতে প্রাণসঞ্চার করে চলেছে। প্রাণের অসীম জগতেও চলেছে এই অবোধ্য প্রাণপ্রবাহের ধারা। নিখিল বিশ্বের এই অদৃশ্য বিরাট প্রাণপ্রবাহকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে আনন্দের অভিব্যক্তি হল —

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে।

*　　*　　*

করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগ-যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

কবি সর্বদাই বলেছেন, এ কোন তত্ত্বকথা নয়, এ আনন্দরূপ। তাই কবি নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের গভীর বন্ধন অনুভব করেছেন।

৫

অনেকে বলে থাকেন বের্গস°'র গতিবাদের প্রভাব কবির কাব্যের উপর অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে। এর উত্তরে কবি খুব সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"য়ুরোপে একদল আছেন যাঁরা ভারতীয় যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে য়ুরোপের কাছে ঋণী প্রমাণ করতে চান। নইলে এদেশে তাঁদের প্রভুতার পক্ষে কিছু অসুবিধে হয়। আবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশেও বহুলোক এখানকার সব দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আগাগোড়া পাশ্চাত্ত্যের কাছে ঋণী বলতে চান। আমার চিন্তার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন করে বলব? সর্বযুগের সর্বদেশের তপস্যাকে আমি শ্রদ্ধা করে তাদের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, নির্জীব, সে পাথর। কিন্তু দেখতে হবে যে কথাটি বলছি তার কোন মূল কি ভারতে পূর্বে কোথাও ছিল না? য়ুরোপীয়েরা ভারতের ভক্তিবাদকে একেবারে খৃষ্টধর্মের কাছে ঋণী সাব্যস্ত করতে চান। যেহেতু

খৃষ্টধর্মকে ভারত এক সময়ে ভদ্রতা করে আশ্রয় দিয়েছিল, তাই তাঁদের এই দাবী। হয়তো কিছু প্রভাব ঘটেও থাকবে, কিন্তু ভারতে কি তার পূর্বে কোথাও ভক্তি ছিল না? আর্য দ্রাবিড় কারও মধ্যেই কি ভক্তি কখনও ছিল না? এখানে তাঁরা শুধু কে আগে কে পিছে এই হিসাব করেই কে ধনী কে ঋণী এই সত্য নির্ণয় করতে চান। কিন্তু খৃষ্টের বহু আগে বুদ্ধ। অথচ খৃষ্টধর্মের উপরে বুদ্ধের কোনো প্রভাবই কি তাঁরা মানতে রাজী?

"ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্ত্য একদল ধর্মব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এই সব কথা খৃষ্টধর্মেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশেরই বহু লোক সেই কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। ঘরের লোককে পর করতে আমাদের মত আর কেউ নেই। এর জন্য বহু দুর্গতি চিরদিন আমরা ভুগেছি। আজও আমরা সেই ভোগ ভুগছি, তবু চৈতন্য হয় না। যাক, তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হল, এই জাতীয় চিন্তা ভারতে ইংরাজ-আমলেই আসে নি। এই সব চিন্তা আরও পূর্বে এই দেশে ছিল। কবীরের মধ্যেও ছিল, কবীরেরও পূর্বে ছিল। কতকাল হতে এই সব ভাব চলে আসছে তা বলা শক্ত। হয়তো বেদ-উপনিষদেরও পূর্ব হতে চলে আসছে এই সব চিন্তার ধারা। এইগুলো আমাদের খুঁজে দেখা দরকার।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যটিকে আরও বিস্তৃত করে বলেছেন—"আমাদের দেশের মতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলছে। হংসের মতই সে লোক হতে লোকান্তরে যাত্রা করে চলেছে। তার মন্ত্র 'চরৈবেতি' অর্থাৎ এগিয়ে চল। আমাদের দেশে লোকে মনীষী সাধক ও গুরুদের কাছে চেয়েছেন, গতি দাও, মুক্তি দাও। মধ্যযুগের সাধকেরা সবাই গতিরই জয়গান করেছেন। বৌদ্ধ-দর্শনে বস্তুমাত্রই গতিতে আপন আপন রূপ নিচ্ছে, তার পরক্ষণেই সেই রূপটি হারিয়ে আবার নব নব রূপ নিয়ে চলেছে। সব নাম ও রূপই নৃত্যের ও গতির ক্ষণিক লীলা মাত্র। কোন স্থির সত্তা নেই। জীবেরও গতির বিশ্রাম নেই, প্রকৃতিরও নেই। প্রাণলীলার বিশ্বচক্র পরিধির মত ক্রমাগত ঘুরছে। বিশ্রাম আছে তার কেন্দ্রে। সেই বিশ্বকেন্দ্রেই পরমাত্মা। তাই পরম সত্যকে চলছে ও চলছে না—দুই-ই বলা চলে। অদৃশ্য বলে যা মনে হচ্ছে, যে অচল, তাও চিন্তার ও মনের চেয়ে বেশী বেগে ধাবমান।

"এই সব তত্ত্ববাদ তো এই দেশে ছিল। অন্ততঃ আমার প্রাণের মধ্যে যে ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। আমার ছেলেবেলার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে আমার কবিতায় গানে নাটকে সর্বত্র এই গতি-ব্যাকুলতা। তবু য়ুরোপের

মনীষীদের গতির কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত সায় ও আনন্দ পেয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা কি? মোট কথা গতিই আমার ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা।” রবীন্দ্রজীবনদর্শন ও ভারতীয় চিন্তাধারার নিবিড় সংযোগের এর থেকে স্পষ্টতর প্রমাণ আর কী হতে পারে?

তত্ত্বের দিক দিয়ে বের্গসঁর মতবাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু সাহিত্যে এর প্রকাশ রসোপলব্ধির সহায়ক হবে এমন কোন কথা নেই। বিশুদ্ধ চেতনার সত্তা আছে কিন্তু প্রাণ নেই, কারণ তা অনুভূতির রসে প্রাণবান নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে বিবর্তনবাদ আছে, অধ্যাত্মবাদ আছে, কিন্তু তা শুধু চেতনলোকেই সীমাবদ্ধ নয়, যুগযুগান্তব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যে তিনি দেখেছেন অবিনশ্বর আত্মাকে। যে আমি শুধু বর্তমানেই নিবদ্ধ নয়, যাব আরম্ভ অনাদিকালে, সেই বৃহত্তর আমি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যে। কবি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রাণীজগতের মধ্যে, এই সৃষ্টিধারার মধ্যে স্রষ্টার নিত্য লীলাবিলাস চলছে। তাঁব লীলার জন্যই এই সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে এত যে বৈচিত্র্য, তা শুধু তাঁবই আনন্দের অভিব্যক্তি। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জড় ও চিন্ময়, সান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড সব কিছু মিলেমিশে এক হয়ে রয়েছে—পরস্পরের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়া শক্ত।

সর্বানুভূতি রবীন্দ্র-কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্বের ছোট-বড় সামান্য-অসামান্য সমস্ত কিছুর মধ্যে কবি এক অপূর্ব প্রাণস্পন্দনের শক্তি অনুভব করেছেন। তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও তিনি অসীম সৃষ্টিরহস্যের অন্তরঙ্গ বলে জেনেছেন, খণ্ড জীবনের মধ্যে চিরন্তন জীবনের স্পন্দন অনুভব করেছেন। তাই ছোট বড় সকলের মধ্যেই তিনি চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই বিশ্বসমষ্টিবোধ রবীন্দ্র-কাব্যে অপরূপ অনির্বচনীয়তা লাভ করেছে। কবি বিচিত্র বিশ্বের বিচিত্র রাগিণীর মধ্যে পরম ঐক্য এবং এই অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানুষের অখণ্ড যোগ বিস্মিত পুলকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি অন্তরে অন্তরে এ কথা নিশ্চয় করে বুঝেছিলেন যে, যে সৃজনলীলা মানুষের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে চলছে তার সঙ্গে বিশ্বের একটা অখণ্ড যোগ আছে ঐক্য আছে, তা না হলে এত বড় বিরাট বিশ্বকে অত্যন্ত অপরিচিত অদ্ভুত বলে বোধ হত। এই মূক মাটির বন্ধন পরিপূর্ণ প্রাণের স্বীকার লাভ করেছে যাঁর জীবনে, তাঁর সম্বন্ধেই শুধু বলা সাজে—“স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।”

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে একান্তভাবে ভালবেসেছিলেন, তাই তাকে নিয়ে তাঁর

গানের ফসল ফলে-ফুলে ভরে উঠেছিল। এই বিশ্বসঙ্গীত তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত গাইতে ক্লান্তিবোধ করেন নি। এ কথা তিনি বিচিত্ররূপে বলেছেন—

আকাশ-ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দোদোলায় কবির প্রাণে অপূর্ব স্পন্দন জাগে, সেই স্পন্দনে কবির কণ্ঠে গান বিচিত্র রাগিণী লাভ করে।

কবি কতবার বলেছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন পুরাতন একাত্মতা কবিকে একান্তভাবে আকর্ষণ করেছে। তিনি বলছেন—"কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি, তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে। তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল—
কিছুতেই নেই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।"

এই জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, তরুলতা, চন্দ্র-সূর্য, বিশ্বের সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কবির চিত্তবীণায় সঙ্গীতমূর্ছনা তুলেছে। কবি স্থির প্রত্যয় লাভ করেছেন যে, এই চেতনাপ্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক জড় ও চিন্ময় জগতে স্পন্দিত হচ্ছে, তাই তার মধ্য থেকে যে ঐকতান উত্থিত হয় তা হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। কবি অহল্যার মত তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে যুগ-যুগান্তের বিশ্বের বিরাট স্পন্দন অনুভব করেছেন—কবি বহুবার দেখিয়েছেন বিশ্বের সঙ্গে এই আন্তরযোগই মানব-জন্মের শ্রেষ্ঠ রহস্য। কবি বসুন্ধরাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর চোখে, মানুষ ধরিত্রীর জীবনের অংশ মাত্র। গর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের সঙ্গে বিলীন হয়ে মাতৃরস পান করে, তেমনি মানুষ জন্মের পূর্ব হতেই ধরিত্রীর রসে সঞ্জীবিত। তারপর কালের চক্রে ঘূর্ণায়মান মানুষ যায় আবার আসে, কিন্তু সম্বন্ধ থাকে অচ্ছেদ্য। তাই "মাটির টান" এত তীব্র। মানুষের কাছে সৃষ্টি তাই বিস্ময়ের বস্তু—

আবার জাগিনু আমি,
রাত্রি হল ক্ষয়—
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব
এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

৭

সৃষ্টির মধ্যে কবি যে শুধু স্নেহ-ভালবাসা, আনন্দ-সৌন্দর্য দেখেছেন তাই নয়, এর মধ্যে যে কী নিদারুণ বেদনা আছে তাও কবির স্পর্শকাতর চিত্তকে অত্যন্ত ব্যাকুল করে তুলেছে। বিশ্বসৃষ্টির ভিতর তিনি নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য দেখেছেন। তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে ধ্বংস, অন্য পদক্ষেপের আঘাতে সৃষ্টি।

তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।

সৃষ্টির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কান পেতে ও চোখ দিয়ে তিনি যেন শুনেছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন—

শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন, দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের অনেক ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময়, বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে

প্রকাশ উৎসবদিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এল তার,
ডুবে গেল অলক্ষ্য অতলে। রূপনিঃস্ব হাহাকার
অতৃপ্ত বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।

তবুও সুখদুঃখতরঙ্গ—

এ দুয়ের মাঝে কোনোখানে আছে কোনো মিল,
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এত কাল কিছুতে বহিতে পারিত না,
সব তার আলো
কীট-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

যিনি চিরদিনই মিলনের কথা বলে এসেছেন, যাঁর অন্তরে আশার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলত, তিনিই আবার বললেন—

ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ অন্ধকার-আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

স্বর্গ ও মর্ত্যেব বিরোধ-বিচ্ছেদ যেখানে অবলুপ্ত, উপলব্ধির সেই গভীর লগ্নের বাণীই রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ বাণী। প্রেম ও শান্তির বাণী যাঁর জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল, জীবনের গোধূলিলগ্নে তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
... ... ...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

৮

এখানে একটি কথা বলে উপসংহার টেনে দিতে চাই যে, কবির সৃষ্টিপ্রবাহ এক সত্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়েছে। সে সত্য এই যে, বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যিনি রয়েছেন, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেও তিনি। তিনি প্রাণরূপে নারায়ণ। রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে পরিব্যাপ্ত হয়ে আপন মাধুরী আপনিই তিনি অনুভব করেন।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে
সূর্য তারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।

তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।

এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে কবি উপলব্ধি করলেন, ইনি প্রাণ, ইনি প্রলয়, ইনি চঞ্চল, ইনি স্থির, ইনি খণ্ড, ইনি অখণ্ড, ইনি সীমা, ইনি অসীম, ইনি সান্ত, ইনি অনন্ত। এঁর থেকেই সৃষ্টি, এতেই বিলয়। বিদ্যাপতির পদ তুলনীয়—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবমান।
তোহি জনম পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা।

উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ। উপনিষদের তত্ত্বানুসারে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আধারস্বরূপ সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মের বিভিন্ন বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সৃষ্টিও ব্রহ্মের ইচ্ছায়—"সোঽমন্যত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েম।" তিনি তপস্যার দ্বারা তৃপ্ত হয়ে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—সৃষ্টিতে যা কিছু প্রকাশিত তাই আনন্দের অমৃতরূপ। এই অনুভূতিই কবির সমস্ত কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এইখানেই তাঁর কাব্যের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। এই অদ্বৈত তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন।

# রবীন্দ্র-কাব্যে নারী ও প্রেম

রবীন্দ্র-প্রেমদর্শনের মূল কথা "যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।" প্রেমকে পূজায় পরিণত করাই রবীন্দ্র-প্রেমসাধনার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

প্রেম মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, অনন্ত সম্পদ, অগাধ রহস্য। যে এই প্রেমের কাছে নিজেকে বিসর্জিত করে, সে প্রেমাস্পদকে অসীম অনন্ত বলেই অনুভব করে। কবি বলেছেন—"জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা।" প্রেম মানুষকে সুন্দর করে, বিকশিত করে তোলে তাকে ফলে-ফুলে রূপে-রসে বর্ণে-গন্ধে।

মানবপ্রেমের অসীম রহস্য, অনন্ত সম্ভাবনা কবিকে চিরদিন বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছে; প্রেমানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ তাঁর কাব্যে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপাসক, প্রেমের একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি দেখেছেন, যেখানে প্রেম সেইখানেই সৌন্দর্য রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে, আর যেখানে সৌন্দর্য সেখানেই প্রেমের প্রতীক বিদ্যমান। তাই প্রেম ও সৌন্দর্য তাঁর কাব্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই দেখা যায়, যেখানে সুন্দরের অনুভূতি ব্যাহত হয় সেখানে তাঁর মন কোনমতেই সায় দিতে পারে নি। তিনি অসুন্দর থেকে সর্বদাই দূরে সরে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই পলায়নী বৃত্তিকে কেউ কেউ প্রশংসার চোখে দেখেন না। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তববিমুখ ছিলেন। এ কথা কিছুটা সত্য হলেও সবটা নয়। যে কবির জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা গভীর মমতাবোধ ছিল এবং যিনি জগতের সব কিছুকেই লীলাময়ের অনন্ত লীলা বলে আজীবন উপলব্ধি করে এসেছেন, তিনি জগৎকে কেমন করে অস্বীকার করবেন? কবি জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার তো করেনই নি, উপরন্তু এর প্রতিটি অণু-পরমাণুর প্রতি তাঁর বিপুল বিস্ময় ও গভীর প্রেমের ব্যঞ্জনাই প্রকাশ পেয়েছে। কবি বার বার বলেছেন, "ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ অন্ধকার-আলো, মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।"

রবীন্দ্রনাথ ইহবিমুখ মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ পৃথিবীর স্নেহ-প্রেম রূপ-রস কিছুই মিথ্যা নয়, মোহ নয়, এর মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্র-দর্শন মানুষকে একান্ত সত্য বলে জেনেছে। তিনি বার বার বলেছেন, মানুষের প্রেমের মধ্যেই আমরা জীবন্ত সত্য

হয়ে উঠতে পারি। মানুষকে বাদ দিলে সত্যের, পরম সুন্দরের সন্ধান কোন দিনই পাওয়া যাবে না। কারণ জীবনের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি যত প্রকার আবেগ আছে তা প্রকাশ হয় মানুষের গভীরতম অনুভূতির দ্বারা এবং এই এক-একটি অনুভূতির সাহায্যে মানুষ বিশ্বরূপ দর্শন করে। কাজেই কবি কোন দিন ভাবতে পারেন নি যে, মানুষের স্নেহ প্রেম প্রীতি মায়ামোহ, জগতের রূপ রস গন্ধ বৈচিত্র্য মিথ্যা। তিনি চেয়েছেন এই বন্ধন, এই বন্ধনের পাশ কাটিয়ে মুক্তিমার্গের সাধক হতে তিনি চান নি। তিনি জীবনসাধক, তাই তো ঋষিকণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। ৯৬

ভোগ ও ত্যাগের মিলন তাঁর ভাবকল্পনাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

কবি জীবনের রূপরস-ভোগী; নানা রসের ক্ষুধা, নানা বৈচিত্র্যের ক্ষুধা কবিকে চিরদিন বিচিত্র পথে চালিত করেছে। তবে কবির ভোগ নিতান্ত বাস্তবগত ও ক্ষণিক ভোগ নয়। পার্থিব প্রেম, দেহের আবেদন-নিবেদন রবীন্দ্রমানসকে কোনদিন বিহ্বল করে তুলতে পারে নি। বাস্তবকে অবলম্বন করে সে ভোগের ক্ষুধা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেও বাস্তবই তার যথাসর্বস্ব নয়; কবি তাকে ক্ষণিক রূপলোক থেকে আদর্শ রূপলোকে উত্তীর্ণ করে, তাকে পরিশুদ্ধ করে, মহত্তর ও বৃহত্তর করে ভোগ করেছেন। প্রেমের ক্ষুদ্রতম প্রকাশকেও কবি বাদ দেন নি; পার্থিব প্রেমের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা ক্ষণিকতা তিনি অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। কবি স্বীকার করেছেন, মানবপ্রেম অনিত্য, মায়াচ্ছন্ন; কিন্তু সেইটাই প্রেমের সবটুকু পরিচয় নয়। তার মধ্যে যে নিত্যসৌরভ আছে তা হৃদয়বেদ্য, অনুভূতিসাপেক্ষ। তাই কবি বলেছেন—

হাওয়ায় ছাওয়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা—
মায়ার চিত্রলেখা।
বস্তু চেয়ে সেই মায়া যে
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন কর।

'কড়ি ও কোমলে' একান্ত বাস্তব ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই একান্ত ভোগকামনার আবহাওয়ায় কবির পক্ষে অধিকক্ষণ নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পরমুহূর্তে সেই অনুভূতিকে বিশ্বের ললামসৌন্দর্যের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তবে তিনি স্বস্তি লাভ করেছেন।

পুরুষের সমস্ত যৌবন মথিত করে যে কামনার উদ্দীপনা জাগে তা নারীকেই কেন্দ্র করে। হৃদয়ের সুপ্ত প্রেম জাগ্রত করে নারী, মনে যে সৌন্দর্যস্পৃহা জাগে তা প্রথম নারীকেই কামনা করে। সৌন্দর্য-উপভোগের সঙ্গে ভোগবৃত্তির একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে সদাজাগ্রত। এই আত্ম-কেন্দ্রাভিমুখী ভোগ-প্রবৃত্তি প্রেমাস্পদকে সবলে আকর্ষণ করে নিজের কামনা চরিতার্থ করে। প্রেমাস্পদের প্রতি নিষ্ঠুর নিপীড়ন ও নিজস্ব সত্তা লুপ্ত করে দিয়েও এই প্রবৃত্তি আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এই ভাবটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে কবির "রাহুর প্রেম" কবিতায়। কিন্তু ভোগপ্রবৃত্তি এখানে কতই না সংযত! 'কড়ি ও কোমল' কবির পূর্ণযৌবনের রচনা। এখানেও দেখি কবির কাছে সারা বিশ্ব নারীময় হয়ে উঠেছে এবং নারীদেহের প্রতিটি তন্তু কবি কামনা করেন। তার মধ্যে প্রথম প্রেমের সুমধুর সঙ্কোচ যেমন আছে উদ্দামতাও ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু এই উদ্দাম ভোগপ্রবৃত্তি কবিকে তৃপ্ত করতে পারে নি—তাঁর ক্লান্ত হৃদয় দেহবন্ধন অতিক্রম করবার জন্য ব্যাকুলতার অন্ত রাখে নি। কবিচিত্ত মূর্ত ও অমূর্ত সৌন্দর্যসম্ভোগের দ্বন্দ্বে চির-আন্দোলিত।

প্রথম বয়সের "যৌবনস্বপ্ন" কবিতায় কবি বলেছেন—

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।

এখানে বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, নারীকে কেন্দ্র করেই কবির নবযৌবনের সৌন্দর্য-ভোগতৃষ্ণা জাগ্রত হয়েছে। নারীর ক্ষণিক স্পর্শে তাঁর যৌবনচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই সুমধুর স্পর্শে দেহমন যেন অপূর্ব সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা শুরু হয়েছে।

তারপর প্রিয়ার সশরীরে উপস্থিতি কবিকে মুগ্ধ বিস্মিত "পরানপাগল" করে তুলেছে। দেহে মনে কবি তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন;

হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়নপানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে,
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।

এই মিলনেও কোথায় যেন অতৃপ্তির বেদনা সারা অন্তরে ছেয়ে রইল। পরিপূর্ণ মিলন কবি আকাঙ্ক্ষা করেন—"যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন," কিন্তু এই স্থূল বাসনাবন্ধনে বন্দী যে প্রেম, তাতে কি পূর্ণ পরিতৃপ্তি হতে পারে? তা কি অসীম সুন্দর হতে পারে? এ প্রেম প্রেম নয়, সঙ্কীর্ণ লালসার পাকে জড়িয়ে পড়ায় প্রেম কামে পরিণত হয়েছে। তাই কবি কাতরকণ্ঠে বললেন—

এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

যে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আবেশ-মদিরা পান করে কবি বিহ্বল হয়ে বলেছিলেন—

লতায় থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

পর-মুহূর্তেই সেই বাহুর বন্ধন যেন কবির কণ্ঠরোধ করে দিতে চাইল। কবি উপলব্ধি করলেন, এ প্রেম সুন্দর নয়, এ বন্ধন। মিলনের পরিতৃপ্তি ভোগের দিক থেকে যতই কাম্য হোক না কেন, রসের দিক থেকে তা বন্ধন। রস চায় মুক্তি। তাই রসের জগতে বিরহের মূল্যই সমধিক। কবি চাইলেন বন্ধনমুক্তি—

দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাশ –
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস—
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।

"সুরদাসের প্রার্থনায়" কবি প্রার্থনা করেছেন যে, ইন্দ্রিয়শক্তি খর্ব হোক, বড় হোক মন। প্রেম তার অসীমতা হারিয়ে একটি মানবমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, তাই কবির মন হাহাকার করে উঠেছে। এই নিষ্ফলতা থেকে কবি মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কবি নারীকে সম্বোধন করে বলেছেন—"পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী," কারণ আমার মত কামনার কলুষস্পর্শে তুমি জর্জরিত নও। তবুও কবি বলছেন—আমি সৌন্দর্য-সম্ভোগের জন্য লুব্ধ, তুমি অসীম সুন্দর, "তাই তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে আঁখি তোমারি হোক।" আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাসনা মানুষকে অকল্যাণের পথে

ঠেলে দেয়। এই অন্ধ প্রেম-সম্ভোগ ছিন্ন না হলে মানুষ বৃহৎ আদর্শ ও প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে না।

কবি নারীর অনাবৃত যৌবনশ্রীর মুগ্ধ উপাসক। কারণ অনাবৃত নারীদেহেই পূর্ণসৌন্দর্যের বিকাশ। তিনি লিখছেন—

ফেল গো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল,
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ—
সুরবালিকার বেশ কিরণ-বসন,
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।

"জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা"কে কবি নিজ জীবনের ভোগপ্রবৃত্তির সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে বিধৃত করে তবে স্বস্তি পেলেন। নারীদেহের সৌন্দর্য বিশ্বসৌন্দর্যের অংশ। বিশ্বসৌন্দর্য অনাবৃত, নারীদেহও তাই অনাবৃত হোক—এই কবির আকাঙ্ক্ষা। শুধু তাই নয়, সেই নির্মল পবিত্র নগ্ন সৌন্দর্যের কাছে সমস্ত স্থূল কামনা বাসনা মস্তক অবনত করুক—

অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত,
আসুক বিমল উষা মানবভবনে—
লাজহীন পবিত্রতা শুভ্র বিবসনে।

'চিত্রা'র "বিজয়িনী" কবিতায় কবি নারীদেহের বর্ণনা দিয়েছেন, দেহের প্রতিটি রূপরেখা অসীম সৌন্দর্য নিয়ে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে, কিন্তু সেই দেহজ রূপকে কবি ভোগের সামগ্রীরূপে দেখেন নি; নারীর অন্তরতম অন্তরে যে আর-এক চিরপবিত্র রূপ, চিরসুন্দর রূপ আছে তাকেই প্রকাশ করেছেন। এই রূপের কাছে, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে পুরুষ কামনাশূন্য হয়ে প্রণতি জানায়। "বিজয়িনী" কবিতাটির তাৎপর্য এই।

রবীন্দ্রনাথ নারীর সৌন্দর্য-মন্দিরের মুগ্ধ পূজারী। নারীর রূপ তিনি দূর থেকে ভক্তিবিমুগ্ধ চিত্তে অবলোকন করেছেন। ভোগের গণ্ডীর মধ্যে এনে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে তাঁর স্পর্শকাতর চিত্ত দ্বিধায় সঙ্কোচে ভরে উঠেছে। রাজকন্যার নিদ্রিত রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মুগ্ধ কবি বলেছেন—

মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষ-'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।

আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি,
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।

নারীদেহের প্রতি কত সম্ভ্রম, কল্পনার কী অপূর্ব শুচিতা!

পরিপূর্ণ সম্ভোগের চিত্র অঙ্কন করলেও কবির মন সেই প্রেমের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিল যে-প্রেম ভীরু, লজ্জারক্তিম, আধ-চেনা আধ-জানা, রহস্যময়। তাই "ব্যক্ত প্রেম" কবিতায় তাঁর নায়িকা বলছে—

ভাঙিয়া দেখিলে ছি-ছি নারীর হৃদয়!
লাজে-ভয়ে-থরথর ভালবাসা সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

তাই নারী করুণ কাকুতি জানাচ্ছে তার প্রেমাস্পদকে—

বসন্ত নিশীথে বঁধু
লহ গন্ধ লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো,
দিয়ো দোল আশেপাশে,
কয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।

শুধু দেহের ক্ষুধা, শুধু ক্ষণিক ভোগতৃপ্তির জন্যই মানুষের জীবন নয়, তার অন্তরেব প্রেম শুধু ক্ষণিকের মোহবিলাস নয়। তাই কবি বলেছেন—

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস;
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

একমাত্র ভোগের জন্যই মনুষ্যজীবন সৃষ্টি হয নি বা ভোগতৃপ্তির জন্যই নারীর সৌন্দর্য নয়। তা যদি হত তবে দেহ-সায়বে অবগাহন করেই মানুষ তৃপ্ত হতে পারত, মানুষকে এ কথা বলতে হত না যে "কেন তুমি মূর্তি হযে এলে, রহিলে ন ধ্যান-ধারণায—", অথবা কাছে পেয়েও মনে হত না—তোমার আধখানা পেলাম, বাকি অর্ধেক কোথায়? কবিকে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলতে হত না—

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি
কোথা তুমি,

যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।

যে নারী এতকাল কামনার ইন্ধনস্বরূপ ছিল এবং যাকে কাছে পেয়েও অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধেই থাকত, আজ অকস্মাৎ যেন সেই নারীর গহনগূঢ় রহস্যটি কবির কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। কেন যে মিলনেও অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধে থাকত আজ যেন কবি তা উপলব্ধি করতে পারলেন। কবি বুঝলেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে ভোগপ্রবৃত্তির আবেগের মিশ্রণে মনে মোহ উৎপন্ন হয় এবং সেই মোহ বৃহতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আবার যে প্রেম "জীবন-মরণময় সুগম্ভীর কথা" শোনাতে চায়, সেই প্রেম জীবনের অনেকখানি হলেও সবটুকু নয়, সমস্ত পরিপূর্ণতার সে একটি অংশ মাত্র। বাসনাবিহীন প্রেম অসম্পূর্ণ। কাজেই প্রেম ও কাম এই দুয়ের সমন্বয়ের সাধনই পূর্ণতার লক্ষণ। নারীর দেহসৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে রয়েছে তার অন্তরতম সৌন্দর্য, তার আত্মার অনির্বাণ দীপ্তি। যে বিশ্বনিয়মে জগতে সৌন্দর্যের শতদল ফুটে উঠেছে, সেই একই বিশ্বনিয়মে নারীর দেহে সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বে যেখানে যত সৌন্দর্য আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়েছে, সবই সেই চিরসুন্দরের অঙ্গদ্যুতি, নারীদেহের অন্তরাল থেকে সেই সত্য-শিব-সুন্দরই নিজেকে রূপে রেখায় আলোকে বিভায় প্রকাশিত করেছেন। কাজেই এই সৌন্দর্য অরূপ, অপরূপ। সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের তাগিদে বিধাতা নারীকে সৃষ্টি করেন নি। তাই তাকে চাইতে গেলেই

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে, শ্রান্ত করে হিয়া।

নারীর ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সৌন্দর্য কবির চিত্তকে পূর্ণতর সৌন্দর্যের জন্য ব্যাকুল করে তুলেছে।

যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর
কী পারিবি দিতে,
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

অনন্ত জীবনকে লাভ করতে হলে অনন্ত প্রেমের প্রয়োজন। সান্ত মানুষ অনন্ত প্রেম পাবে কোথায়—

যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, অন্ধ দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত-জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে?

খণ্ডিত, ক্লান্ত জীবনে যখন অনন্তকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন প্রেমাস্পদের মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য ও প্রেমের আভাসটুকু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল।

ভালবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

দেহসৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, রূপ-যৌবন-সম্ভোগ কোন চরম সার্থকতা দিতে পারে না; ভোগাতীত যে প্রেম তাই সুন্দর, সত্য, চিরন্তন, কল্যাণময়।

ভোগকামনা শান্ত হলে, অসংযত প্রবৃত্তি দমিত হলে কবির প্রশান্ত চিত্তপটে ফুটে উঠেছে মানবীর মধ্যেই তাঁর মানসী। প্রিয়ার চিরন্তন মূর্তি। এই মানসী প্রিয়া এক অনন্ত সৌন্দর্যময়ী, অসীম প্রেমময়ী নারী। সে সর্বকালের সকল প্রিয়ার চিরন্তন প্রতীক। এই প্রিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীকরূপে নিত্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সঙ্কীর্ণ কামনাবন্ধনে তাকে বাঁধতে গেলেই হারাতে হয়। সে কোন ব্যক্তিগত মানুষের নয়, সে বিশ্বের। সে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে সমস্ত কামনা বাসনা অন্তর্হিত হয়। পূজার আবেশে চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে, শান্তরসে হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে। এই অপার্থিব সৌন্দর্যময়ী মূর্তিই নারীর চিরন্তন কল্যাণী মূর্তি, দেবীমূর্তি। নারীকে যতক্ষণ ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা যায় ততক্ষণ তার প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন হয় তখন নারীত্বের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন নারীর মধ্যে জগৎলক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেন। তাই কবি বলেছেন—

যখন তোমার 'পরে পড়ে নি নয়ন,
জগৎলক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

কবি নারীর দুই মূর্তি দেখেছেন—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়।

নারীর মধ্যে দুই ভাবের বিকাশকে কবি বহু জায়গায় লক্ষ্য করেছেন—

একজনা উর্বশী সুন্দরী—
বিশ্বের কামনারাজ্যের রাণী
স্বর্গের অপ্সরী;
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী—
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানে যেমন উর্বশী আছেন তেমনি লক্ষ্মীও আছেন। উর্বশী কামনারাজ্যের নারী—

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।

অন্যজন—

কালে কালে দেশে দেশে শিল্প-স্বপ্নে দেখে রূপখানি—
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি শ্রান্তি,
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
স্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।

উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে।
সেই ছবি আনিতেছে ধ্যান করি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্য সহচরী।

বিশ্বের যৌবনকামনার মূর্তিমতী প্রকাশ উর্বশী জাতীয়া নারী। স্নিগ্ধ শান্ত সৌন্দর্যশালিনী, কল্যাণী, লক্ষ্মীরূপিণী নারীকে কবি তাঁর কাব্যে উচ্চতর আসন দিয়েছেন। কারণ "অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি চির-বিরাজ করে।" কবি তাঁর জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন "সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে।"

কবির ভাব ও রসজীবনের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'মানসী' পর্যন্ত দেহজ রূপ তাকে উদভ্রান্ত করলেও সেইটাই জীবনের সব নয় এ ধারণা তাঁর হয়েছে এবং এর পর থেকে দেহাতীত যে সৌন্দর্য, সেই নিত্য কল্যাণময় চিরন্তন প্রেমের জন্য ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে। 'সোনার তরী' 'চিত্রা', 'চৈতালী'তে কবির অদম্য সৌন্দর্যতৃষ্ণার তৃপ্তি সাধিত হয়েছে—জীবন সত্যকার সৌন্দর্য ও প্রেমের অমৃত স্বাদে ধন্য হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে জিনিসটি অনুভূতিকে স্পর্শ করে সেটি হচ্ছে এর ভিতরকার কমনীয়তা এবং নমনীয়তা। প্রেমের মধ্যে যে একটি শান্ত স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর অনুভূতি আছে সেই অনুভূতিটুকু প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতাকে ঘিরে রয়েছে। কবির প্রথম বয়সের প্রেম কবিতার মধ্যে যে ভাবোচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগ ছিল তা অতি স্বাভাবিক নিয়মেই পরের জীবনে অনেক সংযত ও নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। সব থেকে বেশী যেটি চোখে পড়ে সেটি এর পরম বীর্য। যৌবনের ললিতমধুর কল্পনা এখানে তীক্ষ্ণ প্রকাশ এবং পৌরুষ লাভ করেছে। 'মহুয়া' কাব্যের মধ্যে কবির মনের এই ভাবটি অতি সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'মহুয়া' কাব্যের প্রেম বীরের প্রেম, তা শৌর্যের দ্বারা মহিমান্বিত। নরনারীর প্রেম যে শুধু লীলাবিলাস নয়, শুধু আবেশবিহ্বল হওয়া নয়, শুধু আক্ষেপ অনুযোগ অভিমান নয়—এই ভাবটি 'মহুয়া'র কবিতাগুলিতে সুপরিস্ফুট। এর প্রেম-কবিতায় যে দৃঢ়তা, যে নিঃসংশয়তা, যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসচেতনতা চোখে পড়ে তা সত্যি নূতনতর। এখানে বধূ পুরুষের শুধু পার্থিব সঙ্গিনী নয়, সে তার আত্মার সঙ্গিনী। এই নারীর পরিচয় লাভের জন্য কবি প্রতীক্ষায় আছেন। কবি বলছেন—

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।

অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্যপ্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা,
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান,
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

তারপর আরও আছে—

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহ জিনি,
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ—
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

'মহুয়া' কাব্যে নারীর যে প্রদীপ্ত তেজ, যে নারীত্ববোধের গৌরব এবং আত্মমর্যাদাবোধ দেখা যায় তা সত্যিই পুলকবিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে। এ নারী "দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্র বক্ষে নম্র নেত্রপাতে, স্মিত হাস্যে স্তব্ধ অর্ধরাতে বাসর শয্যা"তে যায় না। এ নারী যথার্থ নারীমর্যাদার কবচকুণ্ডল ধারণ করে অশঙ্কিত চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে এ কথা বলবার স্পর্ধা ও সাহস রাখে—

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্ত গোধূলিতে?
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

রবীন্দ্র-প্রেমদর্শনের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে, নারী পুরুষের কাছে নারী মাত্র নয়, তার মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন বিধাতার তপস্যার আদিম ধ্যানমূর্তি।

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।

শুধু রূপকার নয়, শিল্পী নয়, কবি নয়, প্রত্যেক পুরুষই নারীর মধ্যে দেখতে চায় সেই অতলস্পর্শ রহস্যময়তা—যা পুরুষকে নিত্যনব প্রেরণা যোগায়। পুরুষ আদর্শসন্ধানে চিরচঞ্চল। সে চায় পূর্ণতা, সে চায় মুক্তির চিরানন্দময় আস্বাদ গ্রহণ করতে। তাই বাসনাবন্ধনে নারী তার কাছে বড় স্থূল, বড় বেদনা-দায়িনী। যে নারী পরিচয়ের মাঝেও অপরিচিতা, চিরজানার মাঝেও অজানা, ধরার মাঝেও অধরা, সেই নারীর প্রতি জাগে পুরুষের চিরপ্রেম ও অনন্ত বিস্ময়। নারীর এই আদি ধ্যানমূর্তি কবির কাব্যের কল্পনা, শিল্পীর রূপসাধনা, সুরসাধকের সঙ্গীতমূর্ছনা, সমগ্র পুরুষের আন্তর সাধনা। এই নারী অসীমা, অন্তহীন তার পরিচয়। শাশ্বত নারীর কাছে শাশ্বত পুরুষের এই প্রশ্ন—

কোন্ নির্বাক রহস্যের সামনে ওকে
শুধিয়েছি—
'কে তুমি?
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে?'

# রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ষার ভাবব্যঞ্জনা

রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের প্রারম্ভিক ভিত্তিভূমি থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, একটি সুদৃঢ় আদর্শই কবির ভাব ও কল্পনাকে সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে, এবং এই আদর্শ রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা রূপে নানা রসে ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মানবের কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির একনিষ্ঠ উপাসক। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা কবি প্রথম জীবন থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্লান্ত সুরে গেয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি মানুষের একটি সহজ প্রাণধর্মের আকর্ষণ কবি জীবনের অতিপ্রত্যুষেই উপলব্ধি করেছিলেন। তখন প্রকাশের ভাষা ছিল না, কিন্তু মিলনের আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্নিবার।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন ভৃত্যরাজতন্ত্রের কঠিন শাসনের মধ্যে কেটেছে। বাড়ীর বাইরে যাবার অধিকার ছিল না। কাজেই বাইরের জগৎ কবির কাছে অজ্ঞাত ছিল বললেও হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যেটুকু পরিচয় হয়েছে তা শুধু আড়াল-আবডাল থেকে, নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ তাঁর ছিল না। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, "…সে যেন গবাক্ষের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" কবি বাল্যকালে তাঁর অজ্ঞাত সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড় বিচিত্র আর রহস্যময়। সংসারের নানা আবিলতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মানুষ তার স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পারে না এবং বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি থেকেও সে হয় বঞ্চিত। প্রকৃতি থেকে বাইরে থাকলে তার স্বাভাবিক স্ফুরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আবার লোকালয়ের বাইরে থাকলেও জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ হয় না তাই প্রকৃতি ও মানুষের পূর্ণ মিলন হওয়া প্রয়োজন। বালক রবীন্দ্রনাথ 'কবি-কাহিনী'র মধ্যে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন এবং নিজের অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে নিয়েছেন। উত্তর-জীবনে কবির প্রাণধর্মের যে প্রকৃতি, তার সূচনা কৈশোর-যৌবনের কাব্যসাধনার মধ্যেই নিহিত দেখা যায়। "কবির পরিণত বয়সের একটা বিশিষ্ট ভাব ও আদর্শ অরণ্য ও লোকালয়ের সমন্বয় সাধন। প্রকৃতি ও মানব উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। ইহার একটাকে

উপেক্ষা করিয়া আর একটাকে একান্তভাবে গ্রহণ করিলে জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না—পরিণাম হয় শোচনীয়। নগ্ন প্রকৃতির ক্রোড়ে অরণ্যজীবন ত্যাগের ব্যঞ্জনা করে, আবার প্রকৃতিবর্জিত নিরবচ্ছিন্ন নগরজীবন ভোগের নির্দেশক। একান্ত ভোগ বা একান্ত ত্যাগ—কোনটাই মানুষের পূর্ণ পরিণতির সহায়ক নয়। উভয়ের সমন্বয়ই মানবজীবনের সার্থকতা দান করিতে পারে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। প্রকৃত পক্ষে ইহাই প্রাচীন ভারতের তপোবন-আদর্শ—ত্যাগেব ক্রোড়ে বসিয়া ভোগ।"

যাই হোক, রবীন্দ্র-কবিমানসের বহু বিচিত্র ধারার মধ্যে এইটাই প্রথম ও প্রধান ধারা বলা যেতে পারে যে, মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁকে যেরকম ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এমন আর কোন কিছুই তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি। কবি নিজেই বলেছেন—"প্রকৃতি তাঁহার রূপ রস গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন, তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাদের মুগ্ধ করিযাছে, সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা কবি না। জগতেব মধ্যে আমি মুগ্ধ, মোহেই আমার মুক্তিবসেব আস্বাদন।" এ কথা কবি চিরদিন আনন্দের সঙ্গেই বলেছেন, "যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।" মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিবাশা সফলতা-বিফলতা স্পর্শালু কবিচিত্তকে যেভাবে আন্দোলিত করেছে, প্রকৃতিব শান্ত রুদ্র রূপবৈচিত্র্যও তেমনি কবিকে উদ্বোধিত কবেছে। প্রকৃতিব সঙ্গে মানুষেব একটি গভীর সাদৃশ্য ও সৌহার্দ আছে। প্রকৃতি মানুষের জীবনকে কী ভাবে বিপর্যস্ত কবে বা প্রতিহত করে, তার ছায়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবিব কাব্যে প্রতিফলিত দেখতে পাই। তবুও এ কথা বলতে বাধে না যে, মানুষের অনুভূতিব মধ্যেই প্রকৃতি সার্থক। তাই কবি প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা দিয়ে তাকে অনুভব করেছেন।

প্রকৃতির নব নব পর্যায় কবিচিত্তকে রসানুভূতির ঘন সিঞ্চনে অভিষিক্ত করেছে। ষড়ঋতুব প্রত্যেকটি পরিবর্তন কবির চিত্তবীণায় বিভিন্ন স্পন্দন তুলেছে। বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে বিভিন্ন ফুল পাখী বর্ণ ও গন্ধ মানুষের মনের নিভৃত তন্ত্রীকে আঘাত করে এক অভিনব সুরের মূর্ছনা তোলে। কবি বলেছেন, "এদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছায় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়, তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।"

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রূপপরিবর্তন মানুষের মনকে খণ্ড সময়ের জন্য হলেও প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনযাত্রা থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ভাব, ব্যঞ্জনা, বাণী। মানুষের অর্থবদ্ধ ভাষা তার নাগাল পায় না—তাই প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই অব্যক্ত বাণী লাভ করে অনির্বচনীয়তা। মানুষের জীবনে সে রঙীন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে। তাই বর্ষার কদম্ব ও কেতকী, কেকাধ্বনি, শরতের শুভ্রকাশকুসুম, হংসরব, বসন্তের কিংশুক, নবমল্লিকা, কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের গুঞ্জন মানুষের গোপনগভীর তন্ত্রীতে আঘাত করে চিরজীবনের প্রেমের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন—"নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ-কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবের মতো প্রকৃতির নিগূঢ় স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কি কি সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু-আবর্তনের সবপ্রধান কাজ প্রেম জাগানো; ফুল ফোটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক।"

ঋতুর দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, কবির বেশীর ভাগ কবিতাই বর্ষা ও শরতের, বসন্তেরও আছে কম নয়, কিন্তু তবুও মনে হয় তার মধ্যে বর্ষা-ঋতুই কবিকে উতলা-উন্মনা করেছে সব থেকে বেশী। তার প্রধান কারণ এই যে, কবি শান্তরসের উপাসক। জগৎ ও জীবনের মধ্যে যেখানে হাটের কোলাহল, যেখানে চাঞ্চল্য আর অস্থিরতা, সেখানে কবিচিত্ত বার বার বিমুখ হয়ে ফিরে এসেছে। তাই বসন্ত বা শরৎ-প্রকৃতিতে যেখানে উৎফুল্লতা ও উৎসবের আড়ম্বর বেশী, সেখানে কবিচিত্ত প্রাণমন খুলে স্বীকৃতি জানাতে পারে নি। উৎফুল্লতা ও উৎসবের চাঞ্চল্য শান্তরসের পরিপোষক নয়। কারণ এরা মানুষের মনকে বিচলিত করে, স্নিগ্ধ করে না। মনের এই চাঞ্চল্য চিত্তের শান্ত অবস্থাকে নষ্ট করবার সুযোগ পায়। শান্তরসের মধ্যে একটা উদাস প্রাণ-কাঁদানো সুর আছে, একটি বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃতির ভাব আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্তের মধ্যে সব সময়েই একটি বিষাদকরুণ সুর কোন না কোন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কি চিত্রে কি সঙ্গীতে কি কাব্যে সব জায়গাতেই কবি যেন তাঁর চিত্তবীণার সব কটি

তার নিখাদ সুরে বেঁধে রেখেছেন। তাই দেখা যায়, শরৎ বা বসন্তের আনন্দোচ্ছ্বাসে কবি প্রাণমন খুলে মেতে উঠতে পারেন নি, পরন্তু সেখানেও একটি উদাস সুর ফুটে উঠেছে। এমন দিনেও তিনি বলেন—

আজি শরৎতপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়।
… … …
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসী,
রহে না আবাসে মন হায়।
আজি কে যেন সে নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো,
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়—
"এ নহে এ নহে, নয় গো"।

পরিপূর্ণ চিত্র, সঙ্গীত ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে কবি বর্ষার শ্যামসমারোহের রূপ বর্ণনা করেছেন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে,
নিখিল চিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসছে মত্ত বরষা।

কিন্তু এ সুর যেন কবির স্বভাব-সুর নয়। ধ্বনির এই উল্লাস শুধু বর্ষা-বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, অনুভূতির রাজ্যে বিষাদের কারুণ্যই বেশী। বর্ষা নেমেছে, কবির মন হয়েছে উদাসী পিপাসিত, তাই বুঝি

এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
… … …
জানি না কোন্ অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কবির প্রাণধর্মের সঙ্গে বর্ষা ঋতুর আন্তর সত্তার একটি গভীর যোগ আছে। বর্ষা ঋতু কবির কাছে তাই সবচেয়ে প্রিয়। বর্ষার রহস্যময়তা কবিচিত্তকে ভাবিত করে তুলেছে, এই ঋতুটি নিজেই যেন একটি বেদনার প্রতিমূর্তি। কবি এর ভিতর নিজের অন্তরের প্রতিফলন দেখতে পান বলেই যেন এই ঋতুটিকে তাঁর বড় কাছের ধন বলে মনে হয়। বর্ষা ঋতুর কবিতার অন্তরালে কবি যেন নিজের জীবনবেদনার নীরব দীর্ঘনিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে কবি নিজের চির-ইপ্সিততমের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বর্ষার নিরলস ক্ষণগুলি কবির মনের মধ্যে হয় বিরহ না হয় অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। কল্পনাপ্রবণ মনটি এতই স্পর্শালু যে, অতীতের স্মৃতি মনে হতেই মনটি যেন আপনা হতেই বিষাদখিন্ন হয়ে পড়ে। এর কারণ বর্ষার চিরন্তন বিরহব্যথা মানুষের মনে যুগ-যুগান্তরের বিরহব্যথা জাগিয়ে তোলে। মহাকবি কালিদাসও বলেছেন, মেঘ দেখে অত্যন্ত সুখী ব্যক্তির চিত্তও আনমনা হয়ে পড়ে।

বর্ষাধারার বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে এল মনের পরদায়—আকাশের বেদনার সঙ্গে যেন হৃদয়ের রাগিণী মিলিত হতে চায়—

ঝর ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্বরী,
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।

কবির কাছে বসন্তের পূর্ণিমায় আনন্দ আছে কিন্তু বেদনা নেই। তাই তা অপূর্ণ। শ্রাবণের পূর্ণিমা পূর্ণ; কারণ হাসির কানায় কানায় ভরে সে এনেছে নয়নের জল। নয়নজলেরই জিৎ হল। "বসন্ত রাতে সাথীহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মত। আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন।"

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে?
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে,
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে,
কথা কও মোর হৃদয়ে,
হাত রাখো হাতে।

বর্ষার মেঘমেদুর আকাশে শ্রান্তিবিহীন ধারাপতনের একটা করুণ উদাস সুর বাইরের শব্দরূপকে যেন সমাচ্ছন্ন করে রাখে; বহির্গত মন কেবলই ফিরে আসে অন্তর-রাজ্যের কল্পলোকে। যার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু মিলনের উপায় নেই। তাই কেন কে জানে প্রাণটা আপনা থেকেই ভিতরে ভিতরে ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। তাই বর্ষার বিষাদ-খিন্ন দিনগুলির মধ্যে অতীতের পুঞ্জীভূত বেদনার স্মৃতি একে একে মনের পর্দায় মূর্ত হয়ে উঠতে চায়। কেন এ অব্যক্ত বেদনার সঞ্চার কে বলবে, কিসে উপশমিত হবে তাই বা কে জানে! হারানোর বেদনা সেই চিরদিনের, চিরন্তন প্রশ্নটি নিয়ে তা বার বার হৃদয়ে আঘাত করে। তাই কবির "মনে জাগিতেছে সদা আজি সে কোথায়?"

বর্ষার সর্বপ্রধান কাজ মানুষের মনে চিরন্তন বিরহবেদনা জাগ্রত করা। কবির রচনার মারফৎ এই কাজ চলতে থাকে, তাই বিষয়াসক্ত মানবকে সচেতন করে কবি বলছেন—

হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা আত্মহারা,
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে
বিরহের ব্যথা নাই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্ভ্রান্ত পরানে
সে ভাষার দৌত্য, যাহা হারানো নিজের কাছে আনে
ভেদ করি মরুকারা—
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।

প্রত্যেক মানুষের মনে অনাদিকালের চিরন্তন বিরহী যক্ষ, বিরহিণী রাধা বাসা বেঁধে আছে। বর্ষার মুখর ধারাবর্ষণে প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষ অসহনীয় বিরহবেদনায় উদ্দাম হয়ে ওঠে, রাধার নিঃসঙ্গ কুটিরে নীরবে অশ্রু ঝরে। তাই দেখতে পাই, মহাকবি কালিদাস থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং পরবর্তী কবিদের কাব্যে বর্ষার একটি চিরন্তন রূপ বর্ণিত হয়েছে। সে সব গান প্রিয়মিলনের প্রতীক্ষায় পথ-চাওয়ার গান, নৈরাশ্যবেদনায় অশ্রুসজল হওয়ার গান, আনমনা হৃদয়ের স্খলিত সুরের গান। এ সেই গান, যে গান মনের মধ্যে সারাক্ষণ গুনগুনিয়ে ওঠে—

মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়াল—ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। সেদিনও বোধ হয় এমনিতর ঘনঘটার সমারোহ ছিল যেদিন বিদ্যাপতি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গেয়েছিলেন—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

এই সুরে সুর মিলিয়ে কবি গাইলেন—

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে,
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন করে তার গানে ধ্বনিছে
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

বর্ষার উন্মত্ততায় "প্রাণের কামনা কাঁদিয়া বাহিতে নারে।" প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার—তাই মনে হয়

আজ যদি পাইতাম কাছে
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।

যতদিন কাছে ছিল, "হৃদয়ের বাণী" তাকে শোনানো হয় নি। "জীবনমরণময় সুগম্ভীর" কথাটি বলবার উপযুক্ত সময় পাওয়া যায় নি, প্রাত্যহিক ব্যবহারে তা ছিল মলিন, জড়তাপূর্ণ। কবি 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্যের মুখ দিয়ে সেই চিরন্তন গোপন কথাটি কত সহজ সুরে বলিয়েছেন—

"দুর্দান্ত বৃষ্টি ধারার মধ্যে একটি ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল, যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত চেপে ধরে বলে উঠি—জন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু-হু করে কি যে হেঁকে বলছে তার ঠিক নেই, তারি ভাষায় আজ বনবনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট জগৎ আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়েছে। ...যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে, শোনো তোমরা, আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি। এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখীর মতো। কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে, সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা একদিন অপেক্ষা করেছিলেন।

স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি, আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। আজ কাকে এমন করে বলতে চাই—সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নয়।"

এই বিক্ষুব্ধ বিশ্ব-সংসারের কঠিন চক্রতলে নিষ্পেষিত মানুষ তার সহজতম, সত্যতম মর্মকথাটি বলবার সুযোগ পায় না। বিশেষ দিন ক্ষণ পেলে তা একবার মাত্র কোন রকমে প্রকাশ করে ফেলা যায়। তাই ঘনবর্ষার নিভৃত নিরালায় বসে লাবণ্যর অতি সংযত চিত্তবৃত্তি ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত হয়ে পড়তে কোন সঙ্কোচ বোধ করলনা। কবির কথায়—

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

কারণ আজ—

বলিতে ব্যথিবে না নিজ কান,
চমকি উঠিবে না নিজ প্রাণ।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে,
বাদলবায়ে তার অবসান—
সে কথা ছেয়ে দিবে দুটি প্রাণ।

যে সুগম্ভীর কথা জীবনে প্রকাশের পথ পায় না, যে কথা জগতের বিচিত্র কোলাহলে লুপ্ত হয়ে যায়, তা যেন এই ভরা বাদলের যবনিকার অন্তরালের নিবিড় সান্নিধ্যে বসে বলা যায়। কেন না

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে
হৃদয়-মাঝে যতটা চাই, ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়, হৃদয় বাকী রাখে।

এ কথা সুবিদিত যে, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর পরিচয় ছিল এবং তিনি এর প্রভাবে প্রভাবান্বিতও হয়েছিলেন কম নয়। অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কিন্তু মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে ছিল তার গভীর আন্তর যোগ। আকৈশোর কালিদাসের কাব্যের অনুরাগী বিশ্বকবি কালিদাসবর্ণিত সৌন্দর্যের নিলয়কে নিজের আত্মরসে জারিত করে নিয়েছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিনের যে রূপমোহে উজ্জয়িনীর কবি চির-মেঘদূত প্রণয়ন করলেন, রবীন্দ্রনাথও আষাঢ়ের সেই দুনিবার আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, "আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই

আষাঢের প্রথম-দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়।" মহাকবি "কোন পুণ্য আষাঢের প্রথম দিবসে" "মেঘমন্দ্র শ্লোকে" "বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক" "সঘন সঙ্গীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে" গিয়েছেন কে জানে? কিন্তু বিশ্বকবি কবি কালিদাসের নিকট মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন তাঁর ঋণ, তিনি বলেছেন—

সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে?

কালিদাস সৌন্দর্যভোগের কবি, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপাসক। তিনি শুধু মালঞ্চের মালাকর। কালিদাস কল্পনা করেছেন বর্ষা একটি ঋতু মাত্র নয়, বর্ষা একটি ঋতুপুরুষ। এই ঋতুপুরুষটির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রাণপ্রকৃতি ব্যাকুল, ম্লান, বিষণ্ণ। রামগিরির বিরহাতুর যক্ষ উটজ কুসুমের অর্ঘ্য রচনা করে মেঘকে বন্ধুত্বে বরণ পূর্বক তার বিরহের বার্তা এই দুঃখময় মর্ত্য থেকে নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বর্গধাম সেই অলকাপুরীতে প্রেরণ করেছিল। মর্ত্যের বন্ধন কালিদাস অস্বীকার করেন নি, মর্ত্যের ধূলিলিপ্ত প্রেমও যে নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে, কালিদাস তা তাঁর কাব্যে বহুবার দেখিয়েছেন। 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যে আমরা দেখি, সংযত প্রেমের দ্বারা ভোগাতীত মিলনকে লাভ করা যায়। কিন্তু 'মেঘদূত' কাব্যে কবি দেখিয়েছেন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দৌত্যে বিরহী বিরহিণী মিলনাতুর হৃদয়ে অশরীরী নিত্য প্রেমে, নিত্য জ্যোৎস্নায় সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে মিলিত হয়। এইটাই মেঘদূতের তত্ত্ব বা মূল সুর।

কালিদাসের 'মেঘদূত' রবীন্দ্র মানসের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল সত্য, কিন্তু কবি 'মেঘদূত' অতীত মেঘদূতের পটভূমিকায় 'নবমেঘদূত'। কবি সর্বসংস্কার ও সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে সার্বজনীন ও সার্বকালীন ভাব ও আদর্শ অনুসরণ করেছেন এবং একান্ত নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার লীলারসে আপ্লুত হয়ে গিয়ে স্বরচিত মেঘদূতে যে নূতন অর্থ সঞ্চার করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব, অসাধারণ। মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির অসীম রহস্যের কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাই। এঁদের আমরা মূলতঃ রোমান্টিক কবি বলতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পাই, তার রোমান্টিক মনোধর্মের মধ্যে কখন কি শব্দপদসঞ্চারে মিস্টিক ভাব অনুপ্রবেশ করেছে। সেজন্য কবিকে বলতে ইচ্ছে হয় রোমান্টিক মিস্টিক। কবি প্রথম জীবনে বিশ্বপ্রকৃতির দ্বারা ভাবপুষ্ট, তারপর মানবপ্রকৃতি তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। কিন্তু আবার যখন তিনি প্রকৃতির দিকে

ফিরে তাকালেন, তাঁকে দেখলেন অন্য চোখে। ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি তখন উপসংহৃত হয়ে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। প্রকৃতির স্থূল যবনিকা তখন স্বচ্ছ সূক্ষ্ম তন্তুজালে পরিণত হয়েছে। সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে কবি সর্বত্র দেখলেন সেই অনন্তলীলাময়কে, "যে ছিল মোর মনে মনে" সেই তিনি "শ্রাবণঘন গহন মোহে সবার দিঠি এড়ান" করে অভিসারে আসেন। মেঘদূতের বিরহ ব্যক্তিবিশেষের বিরহ নয়, বিশ্বহৃদয়ের বিরহ—জগতের আদি ভাষা মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিপিবদ্ধ। তাই মেঘদূতের বিরহকে সবযুগের সবকালের বিরহরূপে কবি কল্পনা করেছেন। বর্ষা ঋতু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিরহ জাগিয়েছে তা অনেক জায়গায় বাস্তবপ্রিয়ার নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের। সে প্রিয়তম মানসলোকের কোন্ অগম তীরে বাস করছেন কবি জানেন না। তাই তাঁর আকুল প্রশ্ন—

সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার—
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

কালিদাস যে বিরহ প্রিয়-প্রিয়ার অবিনাশী প্রেমের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন, বর্ষাকালের যে বিরহ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় কেবলমাত্র তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকত, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই বিরহই তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক বর্জন করে মানুষের অন্তরের মধ্যে একটি অশরীরী আকিঞ্চনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দ্বৈত সত্তা, মানুষ আসলে দুইটি মানুষ।—একটি অনন্ত—যাকে লাভ করা সুকঠিন, সে চিরদিনই কামনার ধন; অপরটি সান্ত—যে সংসার ধূলিজালে লিপ্ত—প্রতিদিনের মানুষ। প্রতিদিনের মানুষটিকে ব্যবহার করে ফুরিয়ে ফেলি, তার সবটা জানবার সুযোগ হয় না। কাজেই মানুষে মানুষে যে মিলন তা আধখানা মিলন। সে মিলনেও বিষাদ-শ্রান্ত হৃদয়ে হাতে হাত দিয়ে বলতে হয়—

খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায় সে কোথায়!

এ মিলন মনুষ্যলোকে সম্ভব নয়, কারণ—

**যে জন আপনি ভীত, কাতর দুর্বল,**
**ম্লান, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,**
**আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,**
**সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে?**

এব মধ্যে কোথায় পাব সেই আমার অফুবান একজনকে, সেই আমাব একটিমাত্রকে। "আমি কোথায় পাব তাবে আমাব মনেব মানুষ যে রে?" যন্ত্রতান্ত্রিক জীবনে এ মিলন হবাব নয়, কাবণ পবস্পবেব মধ্যে বিস্তব ব্যবধান, মাঝে অনন্ত অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র ফেনিল হয়ে উঠেছে। পবিপূর্ণ মিলনেও অতৃপ্তিব কাঁটা বিঁধেই থাকে। তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—

দুঁহু কোরে দুঁহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মানুষ চিবকাল এই বিবহ-বেদনা বুকে কবে গুমবে গুমবে মবছে।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে,
এখনো প্রেমের খেলা
সারাদিন সারাবেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।

এই সব "সুখ-সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্য যাহাতে মনে কবাইযা দেয, কাছে আসিতে দেয না, আকাঙ্ক্ষাব উদ্রেক কবে, নিবৃত্তি কবে না, দুইটি মানুষেব মধ্যে এতটা দূব।" কবি আবও বলেছেন, "যাহাবা এক একটা সর্বব্যাপী মনেব মধ্যে এক হইযা ছিল, তাহাবা আজ সব বাহিব হইযা পড়িযাছে। তাই পবস্পরকে দেখিযা চিত্ত স্থিব হইতে পাবিতেছে না. বিবহবিধুব কামনায ব্যাকুল হইয়া পডিতেছে। আবাব হৃদযেব মধ্যে এক হইবাব চেষ্টা কবিতেছে, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।" এই বিবহেব কি কোন মূল আছে, কোন কিনাবা, কোন শেষ? কবিব মত আমাদেব অন্তবেও কি এই শাশ্বত প্রশ্ন দোলা দেয না—

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান –
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেযে কাদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায পথ?

কবিব কাব্যে এ প্রশ্নেব উত্তব খুঁজে পাই। দুবাশাব মোহে মানুষ বিভ্রান্ত, তাই—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

একমাত্র তাকেই চাই যাকে পেলে জীবনেব সমস্ত চাওযা পাওযাব নিবৃত্তি এক মুহূর্তেই হযে যায। কে সে? "জানি না কে, চিনি নাই তাবে।" তবুও তাকে যে পেতেই হবে, কাবণ সে হল এমন জন, "জীবন সর্বস্বধন অর্পিযাছি যাবে

জন্ম জন্ম ধরি।” তাই কবি কতবার বলেছেন—আলোকে-আঁধারে, আশা-নিরাশায় সব যদি ডুবে যায় যাক; শুধু থাক্ আমার এই চেয়ে থাকা; আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ। ঝড়ের রাতে কবি নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে গেয়েছেন—

আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

এই আকুলতাভরা প্রতীক্ষা কি ব্যর্থ হতে পারে? কবির বিশ্বাস পারে না। সেই নিখিলরসামৃত পরমসুন্দরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ কি তাকে ভুলে থাকতে পেরেছে? পৃথিবীর রূপ আর রসবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সেই প্রিয়তমের স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ অঙ্গুরীয় কি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় না? এ ব্যথার পূর্ণ পরিসমাপ্তি একদিন হবেই—এই আশ্বাস তিনি কবি কালিদাসের কাছ থেকেও পেয়েছেন, বিরহী চিত্তকে তাই তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

পূর্ণকে পাবার জন্য অপূর্ণের বেদনাভরা অভিসার অনাদিকাল ধরে অনন্ত প্রবাহে চলে আসছে তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে। কিন্তু যে পরিপূর্ণ সেও তো চুপ করে বসে নেই—

সে যে বাজায় বাঁশি—প্রতীক্ষার বাঁশি,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে,
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে,
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে—
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানসুরে।

পূর্ণতার সঙ্গে সৃষ্টির ব্যবধান রয়েছে, এই ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে পরস্পরের অভিসারযাত্রায়। এই বিচ্ছেদ মিটাতে সে চলে ভবিষ্যতের তোরণে তোরণে, নব নব জীবনে।

এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তা তারি রচে টীকা,
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুনজ্বালা এই বিরহেই।

এই চিরন্তন বিরহ সেই চিরবাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের দ্যোতনা বুকে নিয়ে আশাবৃন্তে প্রাণ ধরে থাকে।

# রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুর স্বরূপ

কবি জীবন-প্রভাতে গেয়েছিলেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—

কবির এই অনিচ্ছা স্বাভাবিক, কারণ এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ কবিচিত্তকে মুগ্ধ বিস্মিত করে রেখেছিল। এই পৃথিবীর স্নেহ-প্রেম তাঁকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, এর প্রতিটি অণুপরমাণুর 'পরে তিনি আনন্দরূপের অমৃতরূপ দেখতে পেয়েছেন। এই মাটির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শুধু এই জীবনেই নয়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার সঙ্গে কবির নাড়ীচলাচলের যোগ রয়েছে। তাই কবি সবদা এর সঙ্গে একটি গভীর গূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভব করতেন। কবি স্থির বুঝেছিলেন যে, মানুষ সৃষ্টির আবর্তে চির-ঘূর্ণায়মান, সে তার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না স্নেহ-প্রেম পিছনে ফেলে জীবন থেকে জীবনান্তরে চলে যাচ্ছে। তবুও এই সম্পূর্ণ জীবনের ক্ষণিক হাসি কান্না মানুষের জীবনের সবখানি জুড়ে আছে। তাই একে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই একে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিতে বা ছেড়ে যেতে মন চায় না এবং সেও অবুঝ "চারি বছরের কন্যাটি"র মত ক্ষীণ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে অশ্রুসজল চোখে বলে "যেতে নাহি দিব।" কিন্তু যেতে দিতে হয়। "মৃত্যু যেন তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা তীরে দাড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই গভীর বেদনাটুকু যারা রইল এবং যারা গেল উভয়েই ভুলে যাবে। বেদনাটুকু ক্ষণিক, এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী; কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি, বিস্মৃতি সত্য নয়। এক একটা বিচ্ছেদ এবং এক একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কি ভয়ঙ্কর সত্য! জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরো ব্যাকুল হয়ে উঠে।" ('ছিন্নপত্র')

কিন্তু এই গভীর বেদনাবোধই চরম প্রাপ্তি নয়। কবি বলেছেন—

এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল,
নহিলে নিখিল

এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না,
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

এই মিলেরই অনুসন্ধান চলেছে রবীন্দ্র-কাব্যে ও জীবনে। এই সামঞ্জস্য সাধনই তাঁর কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। জীবনে ও মরণে, সীমায় ও অসীমে, রূপে ও অরূপে একত্র করে দেখাই হচ্ছে সামগ্রিক দেখা। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হওয়াই কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল।

কবি জীবন-সাধক। জীবনকে ভালবেসেছিলেন বলেই এ কথা বলতে পেরেছিলেন—

জীবন আমার
এত ভালো বাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

আমরা জানি প্রথম জীবনে কবি মৃত্যুকে এত মহীয়ান করে দেখতে পারেন নি। কারণ তখন যৌবনস্বপ্নে বিশ্বের চরাচর ছেয়ে ছিল, তার কোথাও যে কোন রকম ফাঁক থাকতে পারে তা কবি বুঝতে পারেন নি। কবি লিখেছেন—"এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল তখন মনটার মধ্যে কি ধাঁধাই লাগাইয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তেমনি নিশ্চিত সত্যের মত বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মত যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়ে বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম, সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনো মতে মিল করিব কেমন করিয়া?" ('জীবনস্মৃতি')

যৌবনে তিনি মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলেছেন—

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী'পরে—
মুহূর্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখি এই সব দেখা শোনা
ক্ষণিকের মেলা,

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম।
কত আশা কত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম।
তবে মৃত্যু দূরে যাও, এখনি দিও না ভেঙে
এ খেলার পুরী।
ক্ষণিক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হতে
করিয়ো না চুরি।

জীবনের প্রতি অত্যন্ত গভীর মমতাবোধে কবি মৃত্যুকে বার বার দূরে রাখতে চেয়েছেন, কারণ যে জগৎকে কবি এত ভালবেসেছেন সেই জগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে, এ চিন্তা কবির কাছে মর্মান্তিক—

মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে,
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

মৃত্যুতে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ, আকাশের আলো, পৃথিবীর শ্যামলিমা সব পড়ে থাকবে—এ চিন্তা কবির নিকট স্বভাবতঃই বেদনাদায়ক। আনন্দলোকের কবি, সৌন্দর্যলোকের কবি, ধ্যানলোকের কবি, পরিপূর্ণতার কবি এত বড় বেদনাময় একটা ব্যাপারকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, তাই কবি মৃত্যুকে নানাভাবেই দেখতে চেষ্টা করেছেন এবং এই উপলব্ধিকে একটা তত্ত্বের নিরিখে ফেলে তবে আশ্বস্ত হয়েছেন।

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণা নানা কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'চিত্রা'র "মৃত্যুর পরে" কবিতায় কবি জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, খণ্ড ও ক্ষণিক জীবনের কোন পরিপূর্ণতা নেই, খণ্ড-জীবন মৃত্যুর মধ্যে অসীমতা লাভ করে, পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইখানেই জীবনের সার্থকতা।

তিনি আরও বলেছেন, জীবনে যা অসম্পূর্ণ, নিষ্ফল, ব্যর্থ, মৃত্যুর পরে তা অপূর্ব পূর্ণতা লাভ করে। মৃত্যুই জীবনের পূর্ণ সফলতার সহায়ক।

জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি—

কবি আরও বলেছেন, মৃত্যুর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে যে আশ্রয় নিয়েছে তার মুখশ্রী কত প্রশান্তিতে ভরা, কিন্তু যারা পড়ে থাকে তারা কাঁদে হা-হুতাশ করে, তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃত্যুর পিছে পিছে ছুটে যায়, কিন্তু—

সে কি আমাদের ?
পলেক বিচ্ছেদ হায়. তখান তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।

উপনিষদের অমৃতরসে যাঁর মন-প্রাণ ভরপুর তিনি খণ্ড-জীবনকে অনন্ত জীবনের অংশরূপেই দেখেছিলেন। মৃত্যু সেই খণ্ডিত জীবনকে চিরন্তন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়।

কবির জীবন সম্বন্ধে এ অতি সত্য কথা যে, জীবনের কোন চিন্তা, কোন ভাবনা বা কোন অবস্থাকেই কবি কোনদিন চরম বলে ভাবতে পারেন নি। মৃত্যুশোক কবিকে বিহ্বল আশাহান করেছিল ঠিকই, কিন্তু আনন্দবাদী কবি জীবনের এই নৈরাশ্যধর্মকে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। "রুদ্ধগৃহ" শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে কবির এই সদা প্রবহমাণ মনোধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন—"পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া রাখে, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মত খেলা করে।...পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়।...এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়, মৃত্যু যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেন?... ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও। জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দুই দ্বার সমান খুলিয়া রাখ। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করুক।"

সংসারে সবই চলে যায়, কিছুই থাকে না- -এ কথাটি সত্য নয়, কারণ—

মানুষের কাছে
যাওয়া আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।

আমি চাই সেইখানে বিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

পরিপূর্ণতার এই আকাঙ্ক্ষা কবির জীবনে বহুভাবে দেখা দিয়েছে।

কবির মনে এই ধারণা ক্রমশ একটা স্থির প্রত্যয়ে এসে দাঁড়াল যে, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দসম্বন্ধ পাতানো হয়েছে তা যদি জীবনশেষের সঙ্গেসঙ্গেই মিথ্যে হয়ে যায় তবে তার কোন অর্থই থাকে না। মৃত্যুর নিরর্থকতায় যদি বিশ্বের সব সৌন্দর্য প্রেম মাধুর্য ব্যর্থ হয়ে যেত তবে সান্ত্বনার আর কিছু থাকত না। এই বিশ্ব ও মানব-জীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই কবি বলেছেন, এও যেমন সত্য, একদিন মরতে হবে, এই পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে হবে- তাও তেমনি সত্য। এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ সত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই আছে, না হলে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য প্রবঞ্চনার জালস্বরূপ হত। এ দুয়ের মাঝে যদি কোন মিল না থাকত তবে কীটে কাটা পুষ্পের মতই তা শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে যেত।......কিন্তু মহামৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েও তো পৃথিবী কীটে-কাটা পুষ্পের মত কালো হয়ে যায় নি। শতমৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও তার সৌন্দর্য তার প্রেম তেমনি অপরিবর্তনীয় রয়েছে। তাই মনে হয়, মৃত্যু সবগাসী নয়, মৃত্যু চরম নয়, মৃত্যু কুৎসিত বীভৎস নয়— সে সুন্দর, সে শ্রান্তিহারা, সে পরিপূর্ণতা। মৃত্যু সীমার বন্ধন ছিন্ন করে অসীম ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয়, মৃত্যু নিরর্থক নয়, এর পিছনে আছে বৃহৎ উদ্দেশ্য, মহৎ তাৎপর্য।

কবি মৃত্যুমাধুরীর কথা বলেছেন—

পরান কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর এ কি তব অন্তঃপুর?

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর, সবই তাতে বিলম্বিত হয়ে সীমার আবরণ উন্মোচন করে মধুর হয়ে ওঠে। জীবন সীমা, মৃত্যু অসীম। জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয় তবে সে অচলরূপেই সমাপ্তি লাভ করে। মৃত্যু জীবনের বন্ধন মোচন করে তাকে মুক্তি দেয়—

সে এলে সব আগল যাবে ছুটে,
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে।

মরণের মধ্যেই জীবনের জয়মাল্য, কারণ তার মধ্য দিয়ে জীবনকে আরও সার্থক-রূপে দেখা যায়। অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণতারূপে নূতন জীবন পায়। তাই কবি "মৃত্যুর পরে" কবিতায় বলেছেন—

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল!
... ... ...
ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া,
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।

আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তাই ভাবি মৃত্যুই বুঝি জীবনের শেষ, তাই আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। কিন্তু মৃত্যু তো জীবনের শেষ নয়, জীবনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ—

ফুরায় যা তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।

যে সব আলোর যাত্রী আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টির বাহিরে চলে যায় তারা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না, অজানা রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকারের দুয়ার পেরিয়ে আরও আনন্দভরা আলোর দেশে চলে যায়। "জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে নূতনকে কেবলি প্রকাশ করা।" অন্ধকার যেমন আলোকের ব্যঞ্জনা করে, শীত যেমন বসন্তের অগ্রদূত, ফুলের যেমন ফলে পরিণতি, তেমনি মৃত্যুই জীবনের পরিণতি। প্রশান্ত দৃষ্টিতে এই বিশ্বনিখিলের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, শেষ কোথাও নেই, শুধু আছে রূপান্তর মাত্র। খোকা বিদায় কালে তার মাকে বলছে—

পুজোর কাপড় হাতে করে
মাসী যদি শুধায় তোরে
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে',
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়— আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।

প্রিয়জন যখন মৃত্যুতে নয়নসম্মুখ থেকে চলে যায় তখনও সে অন্তর্হিত হয় না—

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

যে কবি একদিন বলেছিলেন যে তাঁর বাণী এ বাতাসে প্রতিধ্বনি জাগাবে না, এ আঁখি আলোর সন্ধান পাবে না, রজনী তার রহস্যবারতা আর শোনাবে না, "শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি মোর শেষ কথা",—সেই কবিই আবার বললেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

"মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।" জগতের কিছুই শেষ হয় না, কারণ শেষ যে অশেষেরই অংশ।

মৃত্যুর কাজ সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

আমি মৃত্যু রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।
যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোনো গর্তে আটকে থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে—
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে—
সে সমুদ্র আমিই।

রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি প্রধান সুর হচ্ছে গতিবাদ। কবি চিরদিনই অনুভব করেছেন যে, কি জড়বিশ্বে, কি প্রাণীবিশ্বে সব কিছুর মধ্যেই এক অবিরাম অবিশ্রাম গতিবেগ আছে। তার এই চলার পথের দুই ধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু। চলার দ্বারা সমস্ত কিছুর ভারসামঞ্জস্য হয়, চলা স্থগিত হলেই সেই সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। বস্তু তখন ভার হয়ে ওঠে। প্রাণ মানেই "অলক্ষিত

চরণের অকারণ অবারণ চলা।” চলার বেগে প্রাণ যেন ঝরনাধারার মত যুগে যুগে রূপ হতে রূপান্তর পরিক্রমা করে চলে আসছে। এই চলা স্থগিত হলেই মৃত্যু। জীবনের এই গতি কিছুতেই রুদ্ধ হতে পারে না; আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র একে হাতছানি দিয়ে ডাকে, মৃত্যুর দ্বার পার হয়ে লোকে লোকান্তরে নব নব উদয়নে আলোকতীর্থে এর নিমন্ত্রণ। এই সৃষ্টিধারা, এই মানবজীবন একটা প্রবল স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে, স্থায়িত্বের বন্ধন একে বাঁধতে পারে না—

সংসার যাবারই বন্যা, তীব্র বেগে চলে পরপারে
এ পারের সব কিছু রাশি-রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে,
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে ;
নয় নয় এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের 'পরে।
……তবু ভালোবাসি,—
চমকে বিনাশ মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণা-তারে উঠে জেগে
জীবনের গান,
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।

সৃষ্টির এই নিরন্তর গতিবেগ ও পরিবর্তনের মধ্যে কবি নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন এবং তাঁর এই বিশ্বাস ক্রমশই দৃঢতর হয়েছে যে, মৃত্যুর মধ্য থেকেই অমৃতের উদ্ভব।

সৃষ্টির মধ্যে নটরাজের নৃত্যকল্পনা কবির অভিনব সৃষ্টি। কবি বলেছেন, সৃষ্টির মধ্যে সেই ক্ষ্যাপা মহাদেবের পাগলামি অহরহ লেগেই আছে। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি নৃত্য করতে করতে চলেছেন—তাঁর এক পদক্ষেপে ধ্বংস, অন্য পদক্ষেপে সৃষ্টি। কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, আসক্তি নেই, সুখ দুঃখে তিনি বিকার-হীন, কেবল উদ্দাম নৃত্যরসে চঞ্চল হয়ে ছুটে চলেছেন। জন্ম ও মৃত্যু নটরাজের ডমরুর ছন্দ, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সে কেবল তাল দেওয়া মাত্র—

জীবন-মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদ-মন্দ্র হে।

নটরাজের পাদস্পর্শে জগতের সমস্ত মলিনতা, সমস্ত পাপ, জীর্ণতা মরণকে অতিক্রম করে পলে পলে শুচিশুভ্র ও পবিত্রতর হয়ে উঠেছে। কবি শিবশম্ভুকে সম্বোধন করে বলছেন—“হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম

পদক্ষেপে সংসারের মহাশূন্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—"বোধ হয় জগতের কোনো কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই, জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই।" 'খেয়া' কাব্য কবির প্রতিভার মধ্যগগনের একটি রশ্মি। সেই সময় জীবন ছিল "বালিকা বধূ"। তখন খেলাধুলা নিয়ে তার দিন কাটত, বরকে ভাবত "তার খেলিবার ধন শুধু।" কিন্তু কবি বলেছেন—

তুমি বুঝিয়াছ মনে,
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া—
শতযুগ করি মানিবে তখন ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে॥

বালিকা বধূর প্রথম মিলনভীতি ভেঙে যাবার পর সে প্রিয়তমের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রিয়তমময় হয়ে ওঠে। প্রিয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষায় তার প্রতীক্ষায় দিন কাটতে থাকে। সংসারের সব কাজ চুকিয়ে বধূ বাসরসজ্জা রচনা করে ভাবতে থাকে—

শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে।

তারপর বিনা সমারোহে, বিনা মঙ্গলাচরণে সেই প্রিয়তম অতি ধীরে অতি চুপে চুপে কাছে এসে মৃদু ভাষে কথা বলে। এত চুপি চুপি আসা বধূ পছন্দ করে না, সে চায়—

তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কবি অতি শৈশবেই মত্যুকে "শ্যাম-সমান" করে দেখতে শিখেছেন। মৃত্যু যে তাপহরণকারী, অমৃতবর্ষণকারী, তা তখনই তিনি বুঝেছিলেন—তাই রাধার মতই প্রেমাতুর হয়ে মৃত্যুরূপী শ্যামকে বলেছেন—

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজুট,
রক্তকমল কর. রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যাম-সমান॥

মিলনাকাঙ্ক্ষায রাধাব অন্তব আতুব, চোখ দিয়ে অশ্রান্ত ধাবায জল ঝরছে, ব্যাকুল রাধা বলছেন—

ব্যাকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন-দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আও রে আও॥

মরণ কখনো জীবনকে ভুলে থাকতে পারে না। তাই রাধা আশ্বাসিত হয়ে বলেছেন যে, আমি জানি তুমি আমায় বিস্মৃত হতে পারবে না, আমায় তুমি কখনও ছেড়ে যাবে না, আমার আশাবৃন্তে যে প্রাণ বেঁচে আছে তা কখনোই তুমি ভেঙে দেবে না। আমি জানি—

হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ।

কবির শেষের দিককার কাব্যে দেখা যায় যে, ক্রমশ সত্যদর্শনের প্রভাবে মৃত্যু-ভাবনা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এই সত্যের পটভূমিকায় জগৎ ও জীবনের যে নানা রূপ কবির চোখে ফুটে উঠেছে তার অতি সহজ সরল অভিব্যক্তি হয়েছে এই সব কাব্যে। এখন কবি সমস্ত বন্ধন চুকিয়ে "জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বরের পরিচয়" পাবার জন্য ব্যাকুল। কবি এখন বুঝেছেন, জীবন ও মৃত্যু দুয়েরই এক রূপ—জীবন বিচিত্র ছলনাজালে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতে রেখেছে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য; মৃত্যুও "ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি" আঁধারে বিছিয়ে রেখেছে। কবি বলেছেন, এ সবই সত্য বলে যে জেনেছে "সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তর-অন্তরে।"

কবি বার বার বলেছেন, জীবনের পরপারে যে অন্ধকার সে তো শূন্যের আবাস-ভূমি নয়, নিঃশেষের অতলস্পর্শ গহ্বর নয়। নবসৃষ্টির ধ্যানগাম্ভীর্য। আলোকের জন্মই তো অন্ধকারের নিভৃত বক্ষে। তাই কবি চিরবিশ্রামের উদ্দেশ্যে অন্ধকারের সিংহদ্বারে উপস্থিত হবার জন্য ব্যাকুল।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে,
যেখানে দিনান্ত রবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
হেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে, 'দ্বার খোলো'।

কবি যতই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর এই অনুভূতি দৃঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে যে, এই চলমান জগৎ ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ভিতর অনন্তের ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। মানুষের চঞ্চল স্নেহ-প্রেম-প্রীতির মধ্যে কবি নিত্যকালের অসীমত্ব উপলব্ধি করেছেন। জীবনের একটি ক্ষণিক মুহূর্তও কবির কাছে গভীর তাৎপর্যময় মনে হয়েছে। উপনিষদের আলোকে আলোকিত কবিজীবন। তিনি মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভূমার স্পর্শ, নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মার অধিষ্ঠানের তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন। আত্মা অবিনাশী চিরন্তন—তাই কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ নেই। "মরণের সিংহদ্বারে" দাঁড়িয়ে কবি জীবনের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করলেন—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

মৃত্যু আজ তাঁর কাছে মহীয়ান, পরিপূর্ণ। অপূর্ণতার সব গ্লানি আজ পূর্ণের পদতলে আত্মাহুতি দিয়ে ধন্য হয়েছে। এই সত্যদৃষ্টি লাভ করে কবি আপনার ঐকান্তিক প্রার্থনা জানালেন—

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
বিরহ-দহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ
তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্য ধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে;
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

জীবন-চেতনার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কবি সর্ববন্ধনপাশ কাটিয়ে চির-পথিকের বাঁশীর ধ্বনি শুনে তার অনুগামী হতে চাইলেন। আজ তিনি মুক্তি চাইছেন, যে মুক্তি "সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে"। সহজ আনন্দধ্যানে আজ তাঁর অন্তর পূর্ণ—

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক-চিত্ত মম
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

# রবীন্দ্র-কাব্যে উৎকণ্ঠিতা

## ১

প্রেম নরনারীর দেহ মনের একটি আদিম বৃত্তি, চিরন্তন সংস্কার। এর গতি বিচিত্র, অমোঘ এর আহ্বান। এতে ব্যথা আছে বেদনা আছে নৈরাশ্য আছে, কিন্তু একে চাই না বলে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা বুঝি কারও নেই—এ অক্ষমতা দেবতার অভিশাপ, না আশীর্বাদ।

এই প্রেম চিরদিনই মানুষকে ব্যাকুল ব্যথিত ভাবিত করে রেখেছে, তাই এর বিচিত্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি জীবনে ও সাহিত্যে। যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়েছে, সকলেরই অন্তঃপ্রেরণা প্রেম। বৈষ্ণব সাহিত্য এ কথার অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বৈষ্ণব পদে প্রেমের যে বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে তা অন্য যে-কোন সাহিত্যেই দুর্লভ। প্রেমের উন্মেষ, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ-বেদনা, বিচ্ছেদ-বেদনার মর্মোচ্ছ্বাস, অভীপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত আক্ষেপ, শেষে ভাবরসে পরিপূর্ণ মিলনানন্দ ইত্যাদি যত প্রকার অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া সম্ভব তার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—বৈষ্ণব কাব্যে আমরা আস্বাদন করতে পারি।

## ২

চিত্তের বিশেষ একটি আকুলতাময় অনুভূতিকেই প্রেম বলে। কেন এই আকুলতার সঞ্চার, কিসেই বা এর উপশম? প্রিয়কে পাবার জন্য এই যে অব্যক্ত অসহনীয় ব্যাকুলতা, তাকে পেলেই এই বেদনার অবসান। তাই প্রতীক্ষায় দিন কাটে মিলনের অন্তহীন আশা বুকে নিয়ে।

বৈষ্ণব রসসাহিত্যে প্রেমাকুলা নায়িকাদের আটটি অবস্থার বর্ণনা আছে—যথাক্রমে অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীন ভর্তৃকা।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবল মাত্র "উৎকণ্ঠিতা" নায়িকাকে নিয়ে। বৈষ্ণব মহাজনেরা উৎকণ্ঠিতা নায়িকার স্বরূপ এই রকম বর্ণনা করেছেন—'নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আসিলে বিরহবশতঃ নায়িকার যে ঔৎসুক্য হয় রসজ্ঞেরা সেই অবস্থাকেই উৎকণ্ঠা বলেন।" অর্থাৎ নায়িকা প্রিয়তমের আসার প্রতীক্ষা করে নিজ দেহ ও গেহ সুসজ্জিত করে রেখেছেন অথচ প্রিয়তমের আগমন বহু-বিলম্বিত হচ্ছে এই রকম অবস্থায় নায়িকার মনে যে বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তাকেই

"উৎকণ্ঠা" বলে এবং যে নায়িকা এই ভাব বহন করে তাকে "উৎকণ্ঠিতা" আখ্যা দেওয়া হয়।

"বাসকসজ্জার শেষে মানের বিরতিতে এবং নায়ক ও নায়িকার পরাধীন অবস্থার জন্য সঙ্গমের অভাব হইলে উৎকণ্ঠা হয়। এই অবস্থায় নায়িকার হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, নায়কের বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা, স্বাস্থ্যভঙ্গ, রোদন এবং নিজের অবস্থা বর্ণনা প্রভৃতি উৎকণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণ।"

( 'বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা' )

৩

বৈষ্ণব মহাজনদের ভাবে অনুভাবিত হয়ে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে উৎকণ্ঠিতা নায়িকার প্রেমরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্র-কাব্যে এই প্রতীক্ষমাণা উৎকণ্ঠিতা নায়িকা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তার বহু চিত্র আমরা কবির কাব্যে দেখতে পাই। এমন কি এ কথাও বোধ হয় বলা যায় যে, এই প্রতীক্ষাপরায়ণতা রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য স্বরূপ।

অনন্ত-বিরহী মানুষ মিলন কামনা করে—কিন্তু ঈপ্সিততম দূরে, বহু দূরে অবস্থান করায় মিলনের সুধাপাত্রটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে প্রতীক্ষার ভাবনা-বেদনায়।

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করে অথবা নাম শ্রবণ করে রাধার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। প্রিয়তমের স্পর্শ পাবার জন্য রাধা আকুল, উৎকণ্ঠিত—তাঁর নবানুরাগ ক্রমেই বর্ধিত হতে লাগল। "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।" রাধা দুঃখ করে বলেছেন, "এখন তখন করি দিবস গমাওল দিবস দিবস করি মাসা"। অর্থাৎ এখন তখন করে দিন গেল, দিন দিন করে মাস, তারপর বৎসরও অতিক্রান্ত হল, কিন্তু প্রিয়তম আজও কত দূরে! শ্রীরাধার দেহলতা নুয়ে পড়তে চায় তবুও আশা ছাড়তে পারেন না।—আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান হৃদয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটে, তাও বুঝি ভাল লাগে। 'গীতাঞ্জলি'তে এই ভাবটির চমৎকার অভিব্যক্তি দেখা যায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কবির রাধা বলছেন—

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে।

চারিদিকে সুধা-ভরা,
ব্যাকুল শ্যামল ধরা,
কাঁদায় রে অনুরাগে,
দেখা নাই পাই,
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভাল লাগে।

রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা দেখি, বাসকসজ্জিকা নিজের দেহ ও গেহ সুসজ্জিত করে প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুলা ও উৎকণ্ঠিতা হয়ে অপেক্ষা করছেন—

একাকিনী বসে থাকে আপনারে সাজায়ে যতনে
বসনে ভূষণে
যৌবনেরে করে মূল্যবান।
... ... ...
এই প্রসাধন-কলা,
নয়নের এ কজ্জল লেখা,
উজ্জ্বল বাসন্তী-রাঙা অঞ্চলের এ বঙ্কিম রেখা
মণ্ডিত করেছে দেহ প্রিয়-সম্ভাষণে।
দক্ষিণ পবনে
অস্পষ্ট উত্তর আসে শিরীষের কম্পিত ছায়ায়।
এই মত দিন যায়—
ফাল্গুনের গন্ধে ভরা দিন
সায়াহ্নিক দিগন্তের সীমন্তে বিলীন।
কুঙ্কুম আভায় আনে
উৎকণ্ঠিত প্রাণে
তুলি দীর্ঘশ্বাস
অভাবিত মিলনের আরক্ত আভাস।

এই "একাকিনী" নায়িকাটিকে দেখে আমাদের কি বৈষ্ণব কবিদের উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধাকে মনে পড়ে না? শ্রীরাধার মত "এখন তখন করি" এই নায়িকাটিরও "এই মত দিন যায়", তারও "পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে।" সারা দিন-রাত্রির জাগরণের পর ক্লান্ত শঙ্কিত হৃদয়ে রাধা ভাবছেন—

পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,
লাগছে মনে ভয়
সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ি
এমন যদি হয়।

যদি হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ারদেশে !

যদি বা তার পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর,
শপথ আমার তোরা কেহ
ভাঙাস নে সে ঘোর।

কারণ রাধার একান্ত ইচ্ছা, যার জন্য এই চেয়ে থাকা, যার জন্য এই দিন গোনা, যার জন্য এই হতাশার বেদনা বহন করা—সেই যেন এসে এই ঘুমঘোর হরণ করে নেয়। "পাখীর রবে" "আলোর মহোৎসবে" "বকুল ফুলের বাসে" রাধা জাগতে চান না। রাধার অন্তরের অন্তস্থলে একটি গোপন বাসনা সযত্নে নীড় বেঁধে তুলছে, তাই রাধা গভীর ঘুমে অচেতন হতেই চান—

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে,
যদি আমার জাগায় তারই
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি
দেখব তারই নয়ন দুটি
মুখে আমার তারই হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন—
দাঁড়াবে সম্মুখে।

এই সুখের স্বপনের কথা কল্পনা করে রাধার দেহ-মন চঞ্চল পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—

প্রথম চমক লাগবে সুখে
চেয়ে তারই করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তার চেতনায় ভরে—
তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।

কিন্তু তবুও "নিদ নাহি আঁখিপাতে।" মন জেগে বসে আছে। পাতার শিহরণে, ফুলের সুবাসে, পাখীর কাকলিতে—সব সময়েই মনে হয় ওই বুঝি সে আসে,—তারই আগমনবার্তা বুঝি এরা বয়ে এনেছে। ঘুমতে রাধার ভয় হয়,

পাছে ঘুমের মাঝে সে এসে ফিরে যায়! তাই তো তার তারা গুনে গুনে বিনিদ্র রজনী যাপন।

নীরব-নিস্তব্ধ শান্তিময়ী রাত্রির ক্রোড়ে সবাই ঘুমে অচেতন। একে একে রুদ্ধ ঘরের প্রদীপগুলি সব কখন গেছে নিবে—এমন নীরব অন্ধকারে—

তুই কেন আজ বেড়াস ফিরি
আলোর অন্ধকারে।
তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে
বনপথের পারে।
... .. ...
ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি,
ওরে শান্তিহারা
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস সাড়া।

পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত দেহ মন, চোখে ঘুমঘোর জড়িয়ে আসে, তবুও ঘুমাতে ভরসা হয় না, কারণ কখন "সে এসে যায় গো পাছে বুকে রেখেছে আগুন জ্বেলে।"

কিন্তু আর এমন করে পথ চেয়ে কতদিন বসে থাকা যায়, লোকেই বা বলবে কী? তাই ক্লান্ত ভিখারিণীর মত কবির রাধা বলছেন—

ওগো, সময় বয়ে যাচ্ছে চলে, রয়েছি কান পেতে—
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি!
তোমার এ পথ দিয়ে কত না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে,
তুমি রবে সবার শেষে!
হেথায় ভিখারিণীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে—
তারে রাখবে মলিন বেশে?

৪

মেঘ দেখলে অত্যন্ত সুখী লোকেরও মন আনমনা হয়ে পড়ে। এই দিনটিতে সে যেন কার নিবিড় সঙ্গ কামনা করে অথচ পায় না, তাই বার বার মন ব্যথিয়ে ওঠে অজানা আকুলতায়। বিরহী চিত্ত বাধন মানতে চায় না, উদ্দাম হয়ে ওঠে মিলনের দুর্ণিবার পিপাসায়। নববর্ষার শ্যামসমারোহ দেখে শ্রীরাধার ঘরে থাকাই দায় হয়েছিল, গৃহ সংসার পরিজন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন কিছুই রাধাকে বেঁধে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। রবীন্দ্রনাথের রাধার মনেও নববর্ষের এই "বাঁধন-

হারা" প্রভাব পড়েছে দেখা যায়। তাঁরও মন প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আকুল-উন্মনা। কবির রাধা বলছেন—

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।

এমন নিবিড় অন্ধকারে তাকে যে পাওয়াই চাই, সেই পাওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে প্রতীক্ষার বেদনা যে অ-ধন্য হয়ে যায়! তাই রাধা অভিমানের সুরে বলছেন—

তুমি যদি না দেখা দাও,
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটবে আমার
এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে।

বৃষ্টিধারা দেখে কবির রাধার মনে হচ্ছে, আকাশ যেন তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে চায়, সেও যেন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় হতাশার বেদনায় অশ্রুমুখী। এমন ঝড়ের রাতে রাধার চোখে ঘুম নেই, উৎকণ্ঠিত চিত্ত নিয়ে তিনি বার বার পথের দিকে চাইছেন। কিন্তু "আজি সে কোথায়?" আবার গভীর রাতে ব্যাকুল বেদনায় রাধার চিত্ত অধীর হয়ে উঠেছে, কে যেন—

নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তার।

"দুরন্ত বাতাসে" প্রাণ কেঁদে বেড়ায়, আষাঢ়সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসে—প্রতীক্ষায় দিন কেটে যায়—রাতও তাই। রাধা বলছেন—

একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় কয়ে,
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে।

আষাঢ়সন্ধ্যা ও শ্রাবণগহন রাত্রি সবই "হরি বিনে" কেটে গেল। "বসন্তের মাতাল-সমীরণ" ও রাধাকে ঘরের বার করতে পারল না—

যাব না গো যাব না যে,
থাকব পড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল-সমীরণে ॥

কেন, কিসের আশ্বাস পেয়েছে সে, কী নিয়ে নিরালা ঘরের কোণে তার দিন কাটবে? বুঝি নতুন আশার উদ্দীপনায় আবার মন ভরে ওঠে।—কিন্তু কই সে তো এল না! আকাশে বাতাসে যে ইঙ্গিত ভাসে তা কি তবে সত্যি নয়! রাধার আবার শঙ্কা জাগে, জাগে ভয়—

এল না তো এখনো সে এল না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে ডাক শুনিনু ভোরে
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা?

প্রতীক্ষার অসহনীয় বেদনার বোঝা কবির রাধা যেন আর বহন করতে পারেন না। তাই—

আমি যে আর সইতে পারিনে,
সুরে বাজে মনের মাঝে গো,
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।
হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি যে আর বইতে পারিনে।

যাকে পাবার জন্য এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা এত আকুলতা এত করুণ মিনতি, সে কি না এসে পারে? আজ না হোক কাল না হোক, শত যুগ পরে হলেও তাকে যে আসতেই হবে, বাস্তব জগতে না এলেও ভাবে অনুমানে সে ধরা দেবেই। তাই রাধা অনুমান করছেন—তাঁর প্রিয়তম যেন আসছেন, তাঁর অশান্ত উত্তরীয় যেন হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছে। তাঁর পদধ্বনি যেন মর্মরে মর্মরে শোনা যাচ্ছে। মিলনের শুভ ইঙ্গিত রাধা যেন গাছে গাছে লতায় পাতায় ফলে ফুলে সর্বত্রই অনুমান করতে পারছেন। রাধা বলছেন—

বুঝিয়াছি অনুভবে বনমর্মররবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে এসেছে সে এসেছে।

রাধা যেন কার পদধ্বনি শুনতে পেলেন—

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন,
সেই মত রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।
পদধ্বনি কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে?

৫

বার বার প্রিয়তমের আগমন-প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। বেদনা ও নিরাশায় প্রাণ ভরে ওঠে, তবুও আশালতা ছিন্ন হয় না কেন? এই বেদনা এই নৈরাশ্য যেন বুকের মণিমালায় রত্ন হয়ে দুলতে থাকে। এই না-পাওয়ার বেদনা, এই ধরা-না-দেওয়ার বেদনা—এ কি ব্যর্থ হতে পারে? এই ব্যথা এই মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই রাধা প্রিয়তমের সঙ্গ লাভ করেছেন। তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তো তাঁকে পাওয়া। তাই তো মনে এই আশ্বাস জাগে—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।

তাই বাধা নির্ণিমেষলোচনে পথ চেয়ে থাকেন—এই "পথ-চাওয়াতেই আনন্দ"। ক্লান্তিবিহীন আশা নিয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে—

সারা দিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা,
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ।
আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

বাধা দুঃসহ দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রিয়তমকে লাভ করবেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে নিত্য নব আশা আর আনন্দে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভালবাসার এই প্রতীক্ষায় যদি হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায় তবে এ কেমনতরো ভালবাসা?

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে করো,
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় প্রতীক্ষার ফল পাওয়া গেল। এতদিনকার "কত না উৎসুক বুকে পথপানে ধাওয়া, কত না চকিত চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া" বুঝি সার্থক হল, ধন্য হল। ভালবাসার দুর্নিবার আকর্ষণে প্রিয়তমকে ধরা দিতেই হল। অবশেষে—

বহুদিন বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিটল সে পরশের
তিয়াষা।

# রবীন্দ্র-কাব্যে মিলন ও বিরহ

এতদিনের যে জাগরণ, ক্রন্দন, প্রতীক্ষা রাধাকে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছিল, আজ তা সত্যিই "সকল কাঁটা ধন্য করে" "শতদল-সম ফুটিল পরম হরষে"। আজ "জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া"। 'খেয়া' কাব্যে "প্রভাত" কবিতায় কবির রাধা যেন অত্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়ে অপ্রত্যাশিত রূপে তাঁর বাঞ্ছিতের স্পর্শ পেয়েছেন। একদিন শ্রাবণরাত্রির ঝড়-জলের দুর্যোগের পর প্রভাতে উঠে তিনি দেখলেন যে, তাঁর শুষ্কতাপিত হৃদয়সরোবর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং তার মাঝখানে অপূর্ব সুন্দর একটি শ্বেত শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে।

> **ইহারি লাগিয়া হৃদ্‌বিদারণ,**
> **এত ক্রন্দন এত জাগরণ,**
> **ছুটেছিল ঝড় ইহারি বেদন**
> **বক্ষে লেখি।**
> **দুখযামিনীর বুকচেরা ধন**
> **হেরিনু এ কী।**

প্রথম মিলনের নব-অনুরাগকম্পিত লগ্নটি কাছে এল—তাই আজ রাধার "সকল পরান ব্যেপে থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে"।

> **গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে**
> **গোধূলি লগন রে,**
> **বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে**
> **সোনার গগন রে।**

দূর পশ্চিম-আকাশ অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, পূরবী সুরে দূর থেকে প্রাণ-ভোলানো বাঁশির সুর ভেসে আসছে, "সে আসে সে আসে সে আসে!" কবির রাধা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন নব মিলনের সাজে সজ্জিত হবার জন্যে, আজ আর অন্য কাজে মন যাচ্ছে না—

> **বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে**
> **নব মিলনের সাজে—**
> **সারা হল কাজ, মিছে কেন আজ**
> **ডাকো মোরে আর কাজে।**

"আর কাজ" ছাড়া রাধার এখন অনেক বড় কাজ বাকি রয়েছে।

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
বাসকশয়ন যে।
ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয়নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
যূথীদল আনি গুণ্ঠনখানি
করিব বয়ন যে,
সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের
বাসকশয়ন যে।

বাসকশয়ন রচিত হবার পর "ধূসর আলোকে" আকাশ ছেয়ে যাবে, তারপব নিবিড় বাতের অন্ধকারে সব একাকার হয়ে যাবে—

তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে।

এই চিব-আকাঙ্ক্ষিত মিলনের দিনটি যেদিন বৈষ্ণব কবির রাধাব কাছে এসেছিল সেদিনও শ্রীবাধা এমনি করে বলেছিলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।

বহু ভাগ্য করেই আজ আমার রাত্রি প্রভাত হয়েছে, কাবণ আজ আমি আমাব প্রিয়তমেব মুখচন্দ্র দেখেছি। আমার জীবন যৌবন সফল হল, চতুর্দিক আজ প্রসন্ন হল। বৃন্দাবনের কুঞ্জমাঝে যাব চকিত নূপুরধ্বনি শুনে শ্রীবাধাব হৃদয়চাঞ্চল্য ঘটেছিল, বহুদিন পরে "শিউলিতলার পাশে পাশে, ঝরা ফুলের বাশে বাশে, শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে" সেই নয়ন-ভুলানোর আবির্ভাব হল।

এতদিন পরে দুঃখের অবসান হল। বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলন হল—সে আনন্দের কথা কি ব্যক্ত করা যায়? এত দিনের এত দুঃখ বেদনা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাই সাথীরা যখন শ্রীরাধাকে প্রশ্ন করলেন তখন রাধা বলছেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল।

অর্থাৎ সে আনন্দের অবধির কথা কি বলা যায়, সে তো চিরদিনই আমার ( মন ) মন্দিরে। পাপিষ্ঠ চন্দ্র এতদিন যে দুঃখ দিয়েছে, প্রিয়মুখদর্শনে তাই সুখে পরিণত হল।

অনুরূপ ধ্বনি কবির রাধার কণ্ঠেও শুনতে পাই। তিনি বলছেন—

বঁধুয়া, হিয়াপর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মৃধু ভাষয়ি
হমার মুখপর চাও রে!
... ... ...
তুঝ মুখ চাহয়ি শত যুগ ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মান অভিমান॥

এই মিলনানন্দের কথা বলতে গিযে কবিব রাধা বলছেন, এ যে কী অপূর্ব অনুভূতি তা বোঝানো যায না, তা অনুভববেদ্য।

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো আমার
জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে,
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
পরান কী নিধি কুড়ালো ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।
... ... ...
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

যার জন্য এত হৃদয়-বিদারণ, এত ক্রন্দন, এত জাগরণ, সেই দুঃখযামিনীর বুক-চেরা ধনকে বুকের মধ্যে পাওয়ার যে কী আনন্দ তা কি ব্যক্ত করা যায়, সে যে অব্যক্ত, অনির্বচনীয়!

এই খুশির বিনিময়ে রাধা কিছুই চান না, প্রিয়তমের বাহুবন্ধনের অতিরিক্ত ধন আর কী আছে! তাই তো রাধা বলছেন—

আমায় অমনি খুশি করে রাখো
কিছুই না দিয়া—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে বাহু বাঁধিয়ে।

এর থেকে বড় সুখ রাধার কাছে আর কিছুই নেই, তাই

ওগো, আজকে আমি সুখে রব
কিছুই না নিয়ে।

মিলনের এই শুভ দিনটিতে বিদ্যাপতির রাধা বলেছিলেন—

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

ভাবটি এই যে, প্রিয়তম যখন কাছে ছিলেন না তখন কোকিলের কণ্ঠধ্বনি ও চন্দ্রের আলো সহ্য করা কষ্টকর হত। কারণ, এইগুলিই মদনের পঞ্চশরকে কার্যকরী করে তোলে। কিন্তু এখন তো সে আশঙ্কা নেই, এখন লক্ষ কোকিল ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদয় হোক, মদনের পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হোক, মলয় পবন এখন মন্দ মন্দ বয়ে যাক—এদের ভয় করবার আর কোন কারণ নেই—কেননা প্রিয়তম এখন কাছে আছেন।

কাছে থাকার আনন্দশিহরণ কবির রাধার চিত্তেও দোলা দেয়। সে আনন্দের হিল্লোল বিশ্ব-প্রকৃতিকেও যৌবনচাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে—

ওগো, জানি না কী নন্দন রাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল সৌগন্ধ্যে,
নবপল্লবমর্মর ছন্দে,
চন্দ্রকিরণ সুধাসিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু সরস মহানন্দে।
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

দুটি হাতে হাত দিয়ে নির্বাক বিস্ময়ে দুজনে কত কাছাকাছি কত আনন্দের কথা বলতে চায়, কিন্তু সব ভুল হয়ে যায়, কী বলতে চায় প্রাণ, বলা হয় না। পরিপূর্ণ মিলনে শুধু তুমি আর আমি—আর সব যেন ভেসে যায়।…কিন্তু এত নিবিড় মিলনসুখের মধ্যেও প্রাণে কেন অকারণ বেদনার সঞ্চার হয়।

কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুম ফোটে দিনযামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি।

মিলনে সুখ আছে কিন্তু তা অশ্রুসিক্ত কেন? কে জানে এ কী বিধান! বৈষ্ণব কবিদের শ্রীরাধা পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেও শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন—

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥

এতদিন পরে চিরবাঞ্ছিতকে কাছে পেয়েও সারা অন্তর কেন হাহাকার করে ওঠে। ভুজপাশে থেকেও রাধা "বিলাপই তাপে তাপযত অন্তর বিরহ পিয়ক করি ভান।" "প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ভরে।" মিলনে বিচ্ছেদভয় চিরন্তন—সব সময়েই হারাই হারাই ভাব। "মিলনপাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে, কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে"।

দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত মিলনের ক্ষণটি বৃথাই অতিবাহিত হতে থাকে—

মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ,
দহে অন্তরে নির্বাক-বহ্নি,
ওষ্ঠে কি নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্মে যে ক্রন্দন, তম্বি,
মাল্য যে দংশিছে হায়,
তোর শয্যা যে কণ্টকশয্যা,
মিলন-সমুদ্রবেলায়
চিরবিচ্ছেদজর্জর মজ্জা।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই মিলন অপেক্ষা বিরহকেই আশ্রয় করেছেন বেশী। তার কারণ, বিরহে আমরা পাই আর মিলনে হারাই। হৃদয়ের ধনকে বাইরে আনতে গেলেই হারাতে হয়, তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন "তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।" রবীন্দ্রনাথ এ কথা বহুবার বহুরূপে বলেছেন—"প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না, কাছের পর্দা আড়াল করেছে।" মিলনের মধ্যে আছে বন্ধন, আছে অচলতার বেদনা; বিরহে ঘটে চিত্তের নিঃসীম প্রসার। সেই প্রসারিত চিত্তের মধ্য দিয়েই ঘটে নিবিড়তম মিলন; যে মিলন বিচ্ছেদভরে কণ্টকিত নয়, অবসাদে ম্রিয়মাণ নয়, সে মিলনে আছে শুধু আনন্দ-বেদনা। স্থূল মিলনে "মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ দহে অন্তরে নির্বাক-বহ্নি।" এ

মিলনে প্রেম চলে না, সে স্থিবতাব অচল বন্ধনে বন্দী, তাই মিলনে বন্ধন। বিরহে প্রেম চলে ও বলে, অচলতাব বন্ধন তাকে পীড়িত কবে তোলে না, সে মুক্ত। এই কথা কবি যক্ষকে উদ্দেশ করে একটি কবিতায় বলেছেন—

হে যক্ষ, যেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো,
সেদিন সঙ্কীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারি আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।
এমন সময় প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে,
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে বাঁধা
পাপড়িগুলি।
সে প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।

যে উদ্দাম চঞ্চল প্রেম স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে বিশ্বনীতিকে উপেক্ষা করেছিল সেই প্রমত্ত প্রেমের উপর প্রভুর শাপ বর্ষিত হল তাকে অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা থেকে মুক্তি দেবার জন্য। প্রিয়ামিলনের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে প্রেম মুক্তি পেল বিশ্বের মাঝে। সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে যে প্রেম "দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে", সে প্রেম মুক্তি পেল চিত্তের নিঃসীম নিবিড়তায়, আকাশের অন্তহীন প্রসারতায়।

মিলন-বাসরে যক্ষ যে প্রিয়াকে লাভ করেছিল সে ছিল রক্ত-মাংসে গড়া একান্ত কাছের প্রিয়া—

একদা যখন বিরহে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।

বিরহী যক্ষ "নিজের অন্তর-আঙিনায়" গড়ে তুলল স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী অপূর্ব মূর্তিখানি। যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী সে আজ আসন পেয়েছে "অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে"।

যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধনছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী-গিরি-অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ।

আজ যক্ষ ভাষা পেয়েছে, সে হয়েছে কবি, আজ তার প্রিয়া বক্ষ ছেড়ে বসেছে তার মর্মতলে, আজ তার আপন সৃষ্টি বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা। যক্ষের প্রেম যতক্ষণ বিরহে চঞ্চল হয়ে "গিরি হতে গিরিশিরে বন হতে বনে" ছুটে চলেছে ততক্ষণ বেদনা নেই, কারণ "নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরম সুন্দর পথে পথে মেলে নিরন্তর।" কিন্তু বেদনা দেখা দিল অলকাপুরীর বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে, কারণ সে প্রেম চলে না, তা প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। তাই কবি বলেছেন—

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গণি গণি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ লাগি রুগ্ন স্তব্ধতারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা
তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা॥

নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড় শোক
নাই মর্ত্যভূমে—
জাগরণ নাহি যার স্বপ্ন মুগ্ধ ঘুমে।

প্রভুশাপ লাভ করে যক্ষ ধন্য হয়েছে, কারণ অপূর্ণতার বিরহ-বেদনাই অহরহ পূর্ণতার দ্বারে আঘাত করছে। যক্ষের প্রেম অপূর্ণ, তাই সে চলেছে অভিসারিকার বেশে পূর্ণের দিকে নব নব আনন্দের পর্যায়ে, কিন্তু যে পূর্ণ সে একা, পথ-চলার আনন্দ তার নেই—সে প্রতীক্ষা করে তার জন্য।

সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।
অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে!
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী,
যে অভিসারিকা তারই জয়।
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

কিন্তু পূর্ণ যে সেও তো বসে নেই, তার প্রতীক্ষার বেদনার মধ্যেই আছে এগিয়ে আসবার আহ্বান। "স্থির তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।"

পূর্ণতার সাথে অপূর্ণতার বিপুল বিচ্ছেদ মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে নব নব জীবনে মরণে।

এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা—
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

# রবীন্দ্র-কাব্যে অভিসার

জীবনে যত প্রকার রসানুভূতি আছে প্রেমই তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আত্মার ধর্ম প্রেম-সাধনা। এই প্রেম অনন্ত, অগাধ রহস্যময়। এর গতি-প্রকৃতি বিচিত্র ও কুটিল। ভাষার অঙ্গুলিতে তাকে ধরা যায় না, অর্থ দিয়ে তাকে বাঁধতে চাওয়া বিড়ম্বনা, সে শুধু অনুভব করবার। রসরসিক ভাগ্যবান প্রেমিকই শুধু তা অনুভব করতে পারেন। এর আকর্ষণ দুর্নিবার, অমোঘ এর আহ্বান। প্রতীক্ষার এ আহ্বানকে উপেক্ষা করবার সাধ্য কারও নেই। নদী-গিরির ওপার থেকে যখন সেই আহ্বান জীবনে এসে সাড়া জাগায় তখন কোন বন্ধনই তাকে বেঁধে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট হয় না। সংসার সমাজ লজ্জা-ভয়-সংকোচ সব কিছু পদদলিত করে ছুটে যেতে সে কোন দ্বিধাবোধ করে না। এইভাবে মানুষ যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর ধরে ছুটে চলেছে প্রেমের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বিসর্জিত করে মুক্তির মহানন্দময় স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য। যুগে যুগে মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয়, জৈবিক কোন প্রয়োজনের তাড়নায় নয়, আপনার দুরতিক্রম্য বাধার মধ্য থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে লাভ করবার জন্য। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে—এই তো মানুষের জীবনের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। এই পথ সহজ সরল কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এ পথ অতি কঠিন পিচ্ছিল, বিঘ্ন-সংকুল, ক্ষুরের ধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয়। প্রেমিক যারা তারা দুঃখ বেদনার এই দুর্গম পথই জীবনে বেছে নিয়েছেন, অশ্রুই তাদের পাথেয়, আত্মনিবেদনই তাঁদের পূর্ণ পরিণতি।

নিত্য আহ্বানের এই কঠিন পথে অগ্রসর হওয়াকেই আমরা বলি "অভিসার"।

মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে কোন এক সৃষ্টির অনাদি কাল থেকে প্রিয়মিলনের এই নিবিড়তম ব্যাকুল বাসনা বক্ষে নিয়ে অভিসারের পথে যাত্রা করে চলেছে।

রবীন্দ্র-কাব্য এই অভিসারেরই কাব্য। সমগ্র রবীন্দ্র-জীবন-লীলা আস্বাদন করলে দেখা যায় যে, অনন্তের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমাগত সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে অসীমের অভিমুখে যাত্রা করবার উদগ্র বাসনা রবীন্দ্র-দর্শনের ভিত্তি। সৃষ্টির অনাদি কাল থেকে মানবাত্মা চলেছে পূর্ণতার অভিসারে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য-সাধনার মধ্যে একটি বিশেষ আকুলতার সুর শোনা যায়। সে সুর হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর। তাই তিনি সব সময়েই সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে, বাধাকে অস্বীকার

করে বা কাটিয়ে অসীমের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চলবার একটি বিশেষ ব্যগ্রতা অনুভব করতেন। সীমার মধ্যে অসীমের মিলন-সাধনই রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল। তাই এই অভিসার-যাত্রা কোনদিনই মন্থর হয় নি। মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের মত কবি কোনদিন বলেন নি যে, কেউ কোথাও নেই, সবই মায়া-মোহ। কবি বিশ্বাস করেছেন সবই আছে অনন্তের অঙ্গরূপে। সীমা বা খণ্ড-আভাসই অসীমকে নির্দেশ করে। অসীম সীমার সমষ্টি ছাড়া তো আর কিছুই নয়। কাজেই সব সীমাকে গ্রহণ করেই সসীম অসীম হয়। শুধু তাই নয়, কবির জীবনে এ এক পরম উপলব্ধি যে, সৃষ্টির মূলে এক বিরাট্ চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, যিনি বিশ্বের সুখে দুঃখে, হর্ষ বিষাদে বিচলিত হন। যিনি অনন্ত হলেও অন্তের মধ্যে, অখণ্ড হলেও খণ্ডের মধ্যে প্রেমে ধরা দিচ্ছেন। তাই তো অন্তের বুকের মধ্যে অনন্তের বাঁশী নিরন্তর বেজেই চলেছে, সীমার মাঝে অসীমের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। অসীম প্রেমে তিনি মানুষকে ক্রমাগতই তাঁর দিকে টানছেন, তাঁরই প্রেমের আকর্ষণে মানুষ তাঁরই দিকে ছুটে চলেছে, দুঃখ-বেদনা হাসি-অশ্রু পতন-অভ্যুদয়ের বিচিত্র পথ অতিক্রম করে।

দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সঙ্কট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।

খণ্ড-সৌন্দর্য মূল অখণ্ড সৌন্দর্যকে পাবার জন্য এক অপূর্ব আনন্দ-বেদনা অন্তরে জাগিয়ে রাখে, তাই চিরবিরহী মানুষ সেই চিরন্তন বস্তুটিকে পাবার জন্য এই অভিসারের পথই বেছে নিয়েছে। এই অনন্ত চলার পথে কত বিচিত্র রূপে রসে

ভাবে মানুষ তাঁর ক্ষণস্পর্শ লাভ করছে। এই ক্ষণ-দর্শন-স্পর্শনের মধ্য দিয়ে সুখ-দুঃখের বিচিত্র পথে মানুষ জন্মে জন্মে চলেছে তাঁরই দিকে। এই তো মানুষের অনন্ত অভিসার-যাত্রা। আমাদের কবি এই যাত্রাপথের মধ্যেই মিলনের সার্থকতা অনুভব করেছেন। প্রকৃত মিলন অপেক্ষা মিলনের আকাঙ্ক্ষাই কবির কাছে অধিক কাম্য ছিল। তিনি পেয়ে পাওয়া ফুরিয়ে ফেলতে চান নি, তাই অন্বেষণই তাঁর কাছে মিলন, তাতেই তাঁর আনন্দ। ক্রমাগত এই অগ্রসর মনোভাবই রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

খণ্ড অখণ্ডকে, সীমা অসীমকে, প্রাণ মহাপ্রাণকে, প্রেম পরমপ্রেমকে অনুসন্ধান করে। এই ভাবেই জগতে চলেছে দান প্রতিদান। সীমা ক্রমাগত অসীমের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং অসীম ক্রমাগত সীমার বন্ধনের ভিতর ধরা দিয়ে সার্থক হয়ে উঠছে। এইভাবে প্রীতির আদান-প্রদানে উভয়ে সার্থক হয়ে উঠছে।

অনন্তের সঙ্গে মানুষের যে নিত্যকালের সম্বন্ধ এ সম্বন্ধের কথা সে ভুলবে কেমন করে? জগতের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের মধ্যে যে তাঁরই ভালবাসার স্পর্শ রয়েছে তাকে কি উপেক্ষা করা যায়? তাই পরস্পর পরস্পরের অপরিহার্য অঙ্গ, একটির অভাবে অপরটি অপূর্ণ। 'বলাকা'র একটি কবিতায় কবি এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া,
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম,
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।

এর থেকে এই ভাবটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক সর্বনিরপেক্ষ পুরুষ নিজের অনন্ত সম্ভাবনা উপলব্ধি করবার জন্য, নিজের লীলারস পান করবার জন্য এই বিশ্বসৃষ্টি করলেন। এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের সার্থকতা লাভের জন্য নিজেকে বিচিত্র রূপে ও রসে ব্যক্ত করলেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি অসীম হয়ে সসীম হয়েছেন। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা, খণ্ড ও অখণ্ড, সীমা ও অসীম পরস্পর পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য। সীমার নিবিড় বন্ধনের মধ্যে ধরা না দিলে অসীমের যেমন কোন সার্থকতা নেই, তেমনি সীমাও অসীমের মধ্যে বিধৃত না হলে তারও কোন সার্থকতা নেই,—দুজনের মধ্যে চলেছে এই অনাদি প্রেমের লীলা। কাজেই এই জগৎসৃষ্টি মিথ্যা নয়, মায়া নয়, মোহ নয়, এর মূলে আছে এক বিরাট্ উদ্দেশ্য, একটি গভীর তাৎপর্য।

**ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,**
**রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,**
**অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,**
**সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা॥**

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেও তাই দেখি শ্রীভগবানের ভিতর রয়েছে অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনা, কিন্তু তিনি নিজে নিজের প্রেম আস্বাদনে অসমর্থ, তাই তিনি সৃষ্টি করলেন মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীকে, তার ভিতর দিয়ে—

**আপন মাধুর্য হরে আপনার মন**
**আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।**

শ্রীভগবান শ্রীরাধার হৃদয়-অতলে অবগাহন করে নিজের অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে সে প্রেম সার্থক করলেন। এই আস্বাদনে রাধারও জীবন সার্থক হয়ে উঠল, তারও "গরবে ভরল দে"।

ভগবান চির-পথিক, চির-অগ্রসরমাণ, নিরুদ্দেশের যাত্রী। মানুষ তাঁর চির-সঙ্গী, কাজেই বহু রূপে, বহু বেশে, বহু রসে সে তাঁর লীলা-স্পর্শ লাভ করছে। কখনো "দুঃখের বেশে", কখনো 'নয়ন-ভুলানো রূপে", কখনো "রুদ্ররূপে", কখনো "ঝড়ের রাতে", কখনো "সাপ-খেলানো বাঁশী হাতে বিদেশী রূপে"— তিনি দেখা দিয়েছেন কবির কাছে।

অসীম ও সসীম উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। একে অন্যকে ছেড়ে অপূর্ণ। কোন্ অনাদি কাল থেকে অনন্ত প্রেমময়ের সঙ্গে চলেছে মানুষের এই প্রেমের খেলা। এক অনির্দিষ্ট অতীত থেকে কবি জীবনস্রোতে ভেসেছেন, তখন থেকেই তিনি পরম দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য একটা অন্তর্গূঢ় গোপন আকাঙ্ক্ষা বহন করে আসছেন, তাই এই অভিসার বিরামবিহীন—অনন্ত। কবি বলেছেন—

**কবে আমি বাহির হলেম তোমারি নাম গেয়ে**
**সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।**

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

শুধু কি কবিই বিরহী বধূটির মত "না জেনে রাত কাটায় জাগি?" শুধু কি মিলনের আশাতেই হৃদয় ছেয়ে থাকে? এক পক্ষের ব্যাকুল প্রতীক্ষা অন্য পক্ষের হৃদয়চাঞ্চল্য কি ঘটায় না? প্রেমের আকর্ষণই দুর্ণিবার, তাই অন্যকেও ছুটে আসতে হয়। সেও কাজ ভোলবার জন্য বারে বারে কাজের কক্ষকোণে ফেরে, সে তাঁকে নিবিড়তম অভিসারে আহ্বান করবেই করবে, সে তাঁকে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। কারণ মানুষের জীবনের অন্তরতম স্থানে তাঁর আসন পাতা আছে তাই তাঁরও এই অভিসার-যাত্রা—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

অনন্ত প্রেমময়ের সঙ্গে যে প্রেমলীলা শুরু হয়েছে, তার পরিণাম পূর্ণ-মিলনে। তাই পূর্ণ-মিলনের আশায় চলেছে মানুষের এই অনন্ত অভিসার-যাত্রা। তিনিও কি চুপ করে বসে আছেন? না, তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন না, প্রেমের প্রতিদান প্রেমিকই দিতে জানে। তাই—

সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আকাশ আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রাছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

পরম প্রিয়তম চলেছেন বাঁশী বাজাতে বাজাতে আর সে পাগল-করা, ঘর-ছাড়া বাঁশীর সুর শুনে মানুষ চলেছে অভিসারের দুর্গম পথে। কারণ—

গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশী উঠছে বেজে
ধৈর্য না র রাখিতে।

তাই—

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে,
ক্লান্তি কিছু বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল ঘেরে।

এই চিরন্তন বিরহ-বেদনা বুকে নিয়ে মানুষ চলেছে প্রেমাভিসারে। এই চলায় ব্যথা আছে, বেদনা আছে, বাধা আছে, বিষাদ আছে, তবুও তাকে যে যেতেই হবে, কারণ সে যে পথ চেয়ে বসে আছে! এখানে শ্রীরাধার অভিসারের কথা মনে পড়ে। কত দুর্গম পথের, কত শত বাধা অতিক্রম করে রাধা প্রিয়-সন্নিধানে পৌঁছতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। গৃহের ও পথের নানা বাধা-বিঘ্নের কথা উল্লেখ করে সখীরা রাধাকে অভিসার-সংকল্প ত্যাগ করতে বলায় রাধা কাতরস্বরে বলছেন—

সখি হে মমু পরীখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।

সখি, আমাকে আর পরীক্ষা করো না। প্রিয়তম যে কী আকুলহৃদয়ে আমার পথ নিরীক্ষণ করছেন তা ভেবে ভেবে আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়কুটীরে কাঁদছে এই বিরহী রাধা। তাই মানুষের সমগ্র জীবন যেন বিরহবিধুর। যে দিন রঙীন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি আসে সে দিন সমস্ত অন্তরাত্মা অসহনীয় আনন্দবেদনায় গুমরে কেঁদে ওঠে। প্রেম পরমপ্রেমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতার কাছে লোকলজ্জা, গুরুজনের ক্রূর দৃষ্টি, বহিঃপ্রকৃতির বাধা—সব হার মানে, কিছুই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। কবি বলেছেন—

দুয়ার খুলে সমুখপানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া,
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে,
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া—
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া॥

তাই তার সব-কিছু পড়ে থাকে পেছনে, সামনে থাকে পরমদয়িত, যিনি তার জন্য অনন্ত কাল প্রতীক্ষা করে রয়েছেন—

বেদনা-দূতী গাহিছে, "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।

নিশীথে ঘন অন্ধকারে—
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে।
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান—
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"
... ... ...
বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে,
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে—
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে

অজানা আনন্দবেদনায় প্রাণ কি জানি কেমন করে, "সে কথা কহিবার নয়", সে শুধু অনুভব করবার। অন্তরের একান্ত নিভৃত কামনা নিদ্রাহীন চোখে পথ চেয়ে থাকে।

এই পথ চেয়ে থাকা, কান পেতে থাকা ব্যর্থ হয় না—তার পদধ্বনি জীবনের বিভিন্ন ঋতুতে শোনা যায়। তাই কবি বলেছেন—

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।

অভিসারিকার চলার পথ শেষ হয় না, কণ্টকে দেহ ক্ষতবিক্ষত, মন অবসাদগ্রস্ত, চোখ অশ্রুরুদ্ধ, অথচ আশা আছে একদিন মিলন হবেই। নিষ্ঠুর প্রেমিকের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না।—

তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও—
ডাকো তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে,

চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে।

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে—
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে প'ড় সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী সম,
বাহির হয়ে এসো তুমি
অন্ধকারে—
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

তাই তো আমার এত গর্ব, আমাকে বাদ দিয়ে তুমি দূরে সরে থাকতে পারবে না, আমার জন্যে তোমায় নীচে আসতেই হবে। কারণ আমায় নইলে তুমি যে তোমাকেও পাবে না—

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

পরস্পরের এই অভিসার যাত্রায় দুঃখ আছে, বেদনা আছে, বাধা বিঘ্ন আছে, নিরাশার তীব্র অনুভূতি আছে, কিন্তু তবুও চোখের জলের মধ্য দিয়ে একটা বিরাট সম্ভাবনীয়তার তটভূমি যেন দেখা যায়। তাই এই অভিসারকে নিরর্থক বা নিরুদ্দেশ যাত্রা বলে মনে হয় না, এ যেন একটি নিশ্চিন্ত উদ্দেশ্যে মধুর দুঃখবহন মাত্র। যাকে কাছে পেতে চাই অথচ পাচ্ছি না, তাকে স্পর্শ করবার আভাসটুকু পাই অথচ সবটা পাই না, কাছে এসেও দূরে সরে যায়—কবির প্রিয়তমের এই লীলা। কবির অনুভূতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাকে পাওয়ার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাকে পাওয়া। তাই কবির চিরদিন "পথ চাওয়াতেই" আনন্দ।

কবির মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, তাঁর প্রিয়তম তাঁকে কাঁদাচ্ছেন বটে কিন্তু একদিন সকল ব্যথা "রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে"। তিনি বুঝেছেন যে, দুঃখের বেশে যে পরমদয়িতের লীলা চলছে তা মিলনকে তীব্রমধুর করবার জন্যই। এই রূপলীলার মধ্যেই জীবনের সব সার্থকতা, সব পূর্ণতা। এই লীলারসেই জীবন মধুময় প্রিয়তমময় হয়ে সৃষ্টির ধারার সঙ্গে একসুরে বাঁধা পড়বে।

নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটে যায় এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাতে বিসর্জন দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে, মানুষও সেইরকম সেই এক অন্তরতম পূর্ণের অভিমুখে ছুটে চলে এবং নিজেকে নিঃসীম করে দিতে চায় পূর্ণের পদতলে। এই তার জীবনে পূর্ণতার স্বাদ, ব্রহ্মসাজুয্য লাভ। এই অনুভূতিই রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

# বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ

## ১

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যখন সবেমাত্র গড়ে উঠছিল, তখন বিদেশী ভাবধারার প্রভাবে বাঙালী তার জাতীয় চিন্তা, আদর্শ, ধ্যানধারণা, সংস্কৃতিকে প্রায় বিসর্জন দিতে বসেছিল। যুরোপীয় সাহিত্যের রসপিপাসা বাঙালীর চিত্তকে এমনভাবে অধিকার করে বসেছিল যে, তার কবল থেকে মুক্তি লাভ করে নিজেদের সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের চেষ্টা করবার মত মনের অবস্থা প্রায় কারও ছিল না। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্যে যখন এমনি বিপর্যয় চলছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

দুই পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করবার উদ্যোগ করে এই দুই মহারথী সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রেরণা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলেছিল। মধুসূদনের সাহিত্যের বাইরে ছিল ভারতীয় আবরণ, কিন্তু অন্তরে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছিল। অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য ছাঁচে ভারতীয় সনাতন ভাবধারাকে ঢেলে এক অপূর্ব রসঘন সাহিত্য সৃষ্টি করলেন।

মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য মন্থন করেছিলেন, তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি যে আদর্শ, ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী নিয়ে কাব্য রচনা করলেন তা হল অসীম বীর্যশালী—অফুরন্ত তার প্রাণাবেগ, সে কাব্যধারাকে ধারণ ও বহন করবার মত শক্তি তখনও বাংলা সাহিত্যের হয় নি। মধুসূদন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে যে বিপ্লব আনয়ন করেন তা প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে। দেব আর পৌরাণিক আখ্যায়িকা, প্রেম-ভক্তি-তত্ত্বাদির গতানুগতিক পদ্ধতির উপর মধুসূদন কল্পনার ঐশ্বর্য ও বিরাটত্ব এবং মহাকাব্যের সুর ধ্বনিত করলেন। কিন্তু জাতিগত মানসিক প্রবণতা এই ওজোগুণসম্পন্ন কাব্যের অনুকূলে ছিল না। মধুসূদনের পর বিহারীলালে এসে পুনরায় আমরা কাব্যক্ষেত্রে জাতিগত মানসিক প্রবণতার অভিব্যক্তি খুঁজে পেলাম।

বিহারীলাল যে কাব্যধারা প্রবর্তন করলেন তাতে বাংলা সাহিত্য তার অন্তর্মুখীন ভাবসাধনাকে আবার ফিরে পেল। বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণা সরল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং বাঙালীর মানসিক প্রবণতা ও জাতিগত ভাবনার অনুকূল হওয়ায় পরবর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্য তাঁর প্রেরণায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিহারীলাল তখনকার ইংরাজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবি-দিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।" ('আধুনিক সাহিত্য')

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে এবং মধুসূদনের কাব্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য এই দুইটি বিপরীতগামী ভাব ও চিন্তামূলক ধারার সমন্বয়ের যে সূত্রপাত হয়েছিল তারই বৃহত্তর প্রকাশ হল বিহারীলালের কাব্যে। কবি বিহারীলাল য়ুরোপীয় সাহিত্যজীবনে যে রূপসাধনা প্রচলিত ছিল, তাকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করে নিয়ে ভারতীয় অরূপসাধনা বা অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে একীভূত করে নিতে পেরেছিলেন। কবি পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের রূপ ও রস সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করে নিয়ে এক স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব ভাবজগতের সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। "বিদেশী ভাবকল্পনা ও রূপভোগ-প্রবৃত্তিকে জাতীয় আধ্যাত্মিকতার সহিত সংযুক্ত করিয়া বিহারীলাল বাঙ্গালীর অতি সংকীর্ণ এবং অতি সূক্ষ্ম জীবনধর্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্য আজ শতপত্রবিস্তারে দিগন্ত প্রসারিত হইয়া বিশ্বসাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিহারীলালকে, মধুসূদনকে এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইবার সৌভাগ্য বাংলার হইয়াছিল বলিয়াই বিদেশী সভ্যতা এবং বিদেশী সাহিত্যের সংঘাত-উপঘাতে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য বিলোপ না হইয়া উত্তরোত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।"

বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্যকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি ভারতীয় সাধনার নিবৃত্তি-মার্গকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে, তিনি জগৎ ও জীবনের রসমাধুর্যই পান করতে চেয়েছিলেন, য়ুরোপীয় প্রবৃত্তিমূলক ঘূর্ণচক্রে নিজের চিত্তবৃত্তিকে বিক্ষিপ্ত হতে দেন নি। তাই বিহারীলালের কাব্যে বহির্মুখী প্রেরণা থাকলেও তাকে অন্তর্মুখী বলা যেতে পারে। "ভারতীয় সাধনার শান্তরস ও য়ুরোপীয় সাধনার সৌন্দর্যপ্রীতি বিহারী-লালের কাব্যসাধনায় নূতন ধর্ম আনিয়াছে, ইহাই আধুনিক বাঙলার গীতি-কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিদেশী সংঘাতের প্রতিক্রিয়া। এই নব আধ্যাত্মিকতার

প্রবর্তক বিহারীলাল এবং এই সাধনার মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ।" ('রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচয়'—ডঃ শচীন সেন)

২

বিহারীলালের যে ক'জন গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের উন্মেষের প্রথমেই কবি বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটবার সুযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বালক ছিলেন তখন বিহারীলাল তাঁদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কবি-হিসাবে ওই পরিবারে তাঁর বিশেষ সম্মান ছিল। সকলেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতেন। বালক রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং ক্রমশ তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মনে মনে তাঁকেই গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। বিহারীলালই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার পথদ্রষ্টা ও মন্ত্রগুরু। এ কথা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে, বিহারীলালের গীতি-কাব্যসুধা পান করেই রবীন্দ্রনাথের লিরিক-প্রতিভা বাল্যকালে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গীতিকাব্যপ্রবণতা। এ কথা সত্যি যে, বিহারীলালের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই গীতি-কবিতার স্রোত বাংলা সাহিত্যকে সরস করে রেখেছিল। কিন্তু এখানে এইটুকু বলবার আছে যে, সেই যুগের লিরিক কবিতার সুর এবং আধুনিক কালের লিরিক কবিতার সুরের ভিতর কিছুটা পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। লিরিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মানুষের নিবিড় রসানুভূতিকে অল্প আয়তনের মধ্যে অতি সংহতভাবে প্রকাশ করে। এখানে আড়ম্বরের স্থান নেই, মানুষের অন্তরের বাণীটি যেন হীরার টুকরোর মত এতে প্রকাশ পায়। বৈষ্ণব কবিতা খাঁটি লিরিক কবিতার সুন্দর নিদর্শন।

বৈষ্ণব কবিতায় আমরা দেখি মানবহৃদয়ের অফুরন্ত প্রেমানুভূতির বহু বৈচিত্র্য আর রসঘন প্রকাশ। কিন্তু লিরিক কবিতা শুধু মানুষের অন্তরের অনুভূতিটুকুই বাণীরূপে প্রকাশ করে না, তার মধ্যে কবির ব্যক্তিপুরুষটিকেও বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে তোলে। লিরিক কবিতা কবির নিজের কথা। বৈষ্ণব কবিতা লিরিক কবিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেও এতে সব সময়ে আমরা কবির ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় পাই না। বৈষ্ণব কবিরা নিজেদের অন্তরের মানবীয় প্রেমকে যেখানে রাধাকৃষ্ণের জবানীতে প্রকাশ করেছেন সেখানে আমরা কবির অন্তরের সান্নিধ্য পেলেও পুরোপুরি সে সান্নিধ্য পাই না। কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের একটা ব্যবধান থেকেই

যায়। কিন্তু বিহারীলালের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম কবির ব্যক্তিপুরুষটির সহজ সরল সুস্পষ্ট স্পর্শ লাভ করি। কবি নিভৃত-নিরালায় বসে গান গাইলেন—

সর্বদাই হু-হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ কী জ্বলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীতি কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।…আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। বঙ্গ-সাহিত্যে বিহারীলালই সর্বপ্রথম কবি, যাঁহার ধাতটি একেবারেই লিরিক এবং এই লিরিকের বৈশিষ্ট্যেই বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ স্থান" ('আধুনিক সাহিত্য')। কাব্যের মধ্য দিয়ে এমন নিবিড় ঘনিষ্ঠতার স্পর্শ বিহারী-লালের কাব্যেই প্রথম পাওয়া যায়। এমন সহজ আত্মপ্রকাশ তখনকার দিনে খুব অল্প কাব্যেই দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বালক ছিলেন তখন বিহারী-লালের এক-একটি কবিতা তাঁকে এত বেশী চঞ্চল করে তুলত যে তিনি সেই নূতন জীবনানন্দলাভের স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাড়ীর বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ীর ভিতরেও আমরা সবত্র যেমন খুশী যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির হইতে একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল, যাহা আমার অতীত, যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলনের জন্য বালকচিত্ত যখন একান্ত উন্মুখ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে তখন বিহারীলালের কাব্যে তা পেল মুক্তির আহ্বান—

কভু ভাবি কোনো ঝরনার
উপলে বন্ধুর যার ধার,

প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার,
গিয়ে তার তীরতরুতলে
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
ভাসাইয়া এ শরীর
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জলকলকলে।

অথবা—

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।
গর্বভরে অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায়;
বৃক্ষলতা অগণন
ঘের করে আছে ঘন বন
উপরে বিষাদ-বায়ু বায়।

এই সব কবিতা রবীন্দ্রনাথের মনে কী দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায় তাঁর লেখনী থেকে—"এই সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাময়িক অন্য কবির রচনাতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে—কিন্তু তাহা প্রথাসঙ্গত বর্ণনামাত্র, তাহা কেবল কবির কর্তব্য পালন। তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "কবি যে মন হু-হু করিবার কথা লিখিয়াছেন, তাহা কি প্রকৃতির বলিতে পারি না। কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক পাঠকের মন হু-হু করিয়া উঠিত ('আধুনিক সাহিত্য')।" বিহারীলালের এই অনুভূতি পরবর্তী কালের রবীন্দ্র-কাব্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে—'চিত্রা' কাব্যে আর "বসুন্ধরা" কবিতায়। এখানেও রবীন্দ্রনাথের বাসনা বিহারীলালেরই অনুরূপ, —তাঁরও ইচ্ছে হয়—

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত। বিদারিয়া

এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার - হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়', বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া, চলে যাই সমস্ত-ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে , শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে :

৩

বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম প্রকৃতিকে বিষয়বস্তুরূপে কবিতারচনার পথ প্রদর্শন করেন বলে মনে হয়। কিন্তু গুপ্তকবির হাতে প্রকৃত নিসর্গকবিতার স্বরূপ প্রকাশ পায় নি। তিনি প্রকৃতিকে রেখেছিলেন বাইরে এবং দেখেছিলেন সংস্কারের চোখ দিয়ে, অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন নি।

মধুসূদনের মধ্যে প্রকৃতির যা বর্ণনা আছে তাতে বর্ণনীয় বস্তু সবই আছে, নেই কেবল প্রকৃতি নিজে!

কবি হেমচন্দ্রের ভিতরেও আমরা প্রকৃত নিসর্গকবিতা পাই না।

নবীনচন্দ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে নিসর্গকবিতার আভাস পাওয়া যায়, যদিও গতানুগতিক ভাব তাতে প্রবল।

কবি বিহারীলালের কবিতার মধ্যেই প্রথম প্রকৃতির পানে চোখ মেলে চাওয়ার পরিচয় আমরা পাই। তাঁর—

ডুবেছে রবির কায়া, দিবা হল অবসান!
পড়েছে প্রশান্ত ছায়া জুড়াতে জগৎ-প্রাণ।
চারিদিক সুশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবা এক পরিমল ভাসিয়া বেড়ায়।
... ... ...
নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জলতলে ঝলমলে বিশাল মশাল।

লুকায় তপনরেখা
ফের বুঝি যায় দেখা।
হারানো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল !

এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে "সন্ধ্যা" কবিতায় অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কল্পনা, বর্ণনা এবং বিজ্ঞানের তত্ত্ব একসূত্রে গেঁথে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা-কালের একটি ধ্যানগম্ভীর বিষাদাচ্ছন্ন ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সমস্ত সন্ধ্যার মৌন ভাবটি যেন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কবির –

ক্ষান্ত হও, ধীরে কথা কও। ওরে মন,
নত কর শির। দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য প্রদীপ জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।...
হেরো মৌন নভস্থল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল,
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্বাক নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী, নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়নযুগল,
অনন্ত আকাশ পূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন।

বিহারীলালের নিসর্গ-কবিতার মধ্যে ভাব আছে, চিত্র আছে, প্রীতি-বিভোরতাও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গীত নেই যা রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতাগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসে নিসর্গ কবিতা এক অপূর্ব রূপ লাভ করেছে। কবির—

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত , সুন্দর বাতাস
মুখে চোখেবক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে , ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি যেন দীর্ঘ জলচর

রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটির;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মত।

অথবা—

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম, পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না, শূন্য মাঠ জনহীন,
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটির-অঙ্গনে বাঁধা ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়।

কবির বর্ষার কবিতাগুলির চমৎকারিত্বের আর তুলনা হয় না—

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের এই নিসর্গ-কবিতাগুলিকে অনবদ্য বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। দেশী বিদেশী যে-কোন সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যে স্বর সম্পূর্ণতা লাভ করেছে তারই পূর্বাভাস দেখা গিয়েছে বিহারীলালের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা যে subjective বা ব্যক্তি-সাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখি তার মূলে রয়েছে বিহারীলালের অনুপ্রেরণা। তাঁর পূর্বে এই দৃষ্টিভঙ্গী বা রচনাপদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

৪

রবীন্দ্রনাথ যখন বালক তখন কতদিন তাঁর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জেগেছে যে বিহারীলালের মত কাব্য লিখতে হবে। কখনও বা মনে হয়েছে, বিহারীলালের মতই কাব্য লিখছেন। এ আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর ভিতর কতখানি তীব্র ও সত্য ছিল তা আমরা তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' তুলনা করে পড়লেই বুঝতে পারি।

কবি শুধু বিহারীলালের ভাবই গ্রহণ করেন নি, এর ভাষা পর্যন্ত 'সারদামঙ্গলে'র সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই গীতিনাট্যখানি তাঁর মৌলিক রচনা নয়, দেশের এবং বিদেশেরও অনেক কাব্যের ছাপ এতে আছে।

বাল্মীকির কবিত্বলাভের বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের দিকে না গিয়ে বিহারীলালকেই অনুসরণ করেছেন। 'সারদামঙ্গলে' আমরা দেখি, কবি প্রথমে বাল্মীকির তপোবনের একটি শান্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী উষাদেবীর আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভাতে'ও ঠিক সেই তপোবনের দৃশ্য। "ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি রে!"

বিহারীলালের কাব্যে ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে করুণহৃদয় মুনি যখন বিহ্বলপ্রায়, তখন সহসা—

কবির ললাটভালে জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে ('সারদামঙ্গল')

'বাল্মীকি-প্রতিভাতে'ও দেখতে পাওয়া যায়, ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে মুহ্যমান মুনির হৃদয় বিদীর্ণ করে যখন প্রথম শ্লোক বেরিয়ে এল তখন কবি চকিতবিস্ময়ে দেখলেন,—

পুলকে পুরিল মন প্রাণ, মধু বরষিল প্রাণে
এ কি! হৃদয়ে এ কি দেখি!
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কি জ্যোতিভার
অবাক! করুণা কার!

বিহারীলালের মত রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন যে, কমলার কৃপাদৃষ্টিতে তৃপ্তি নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই, কিন্তু সরস্বতীর প্রসাদ জীবনে এনে দেয় অনির্বচনীয় আনন্দ। সে আনন্দের কাছে সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই কৃপাদৃষ্টিটুকু পেলে আর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। তাই বিহারীলালের কাব্যে দেখা যায় যে সরস্বতীর আবির্ভাবের পর লক্ষ্মী এসে যখন কবিকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন, তখন কবি গাইলেন—

এমন করুণা মেয়ে
আছে যার মুখ চেয়ে
ছলিতে এসেছ তারে কেন গো চপলা?
হেরে কন্যা করুণায়
শোক তাপ দূরে যায়
কি কাজ কি কাজ তার তোমায় কমলা!
('সারদামঙ্গল'—প্রথম সর্গ)

রবীন্দ্রনাথেও এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

কোথায় সেই উষাময়ী প্রতিমা,
তুমি ত নহ সে দেবী কমলাসনা,
করো না আমারে ছলনা।
এনেছ কি ধন মান? তাহা যে চাহে না প্রাণ
দেবি গো চাহি না, চাহি না মণিময় ধূলিরাশি
চাহি না।
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি দেবী সে সুখ চাহি না। ('বাল্মীকি-প্রতিভা', বহিদৃশ্য)

সরস্বতীর করুণা লাভ করে বিহারীলাল কমলাকে বিদায়বাণী শোনালেন,—

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এসো না যোগিজন-তপোবনে আর।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা অনুরূপ সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়
এ বনে এসো না এসো না।
এসো না এ দীনজন-কুটিরে।
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভরে,
আর কিছু চাহি না চাহি না।

লক্ষ্মী যখন বিদায় নিলেন তখন কবি সরস্বতীকে সাদর আমন্ত্রণ করে নিলেন। 'সারদামঙ্গলে'র বিভিন্ন সর্গে সরস্বতীর বর্ণনা—

এস মা করুণারাণী
ও বিধু বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি গো আবার—
এস আদরিণী বাণী সম্মুখে আমার।
... ... ...
কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মাধুরিমা
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলয় অমৃতরাশি
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা?
... ... ...
বসন্তের বনমালা
ঘুমের রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপনসুন্দরী।

অদর্শন হলে তুমি
ত্যজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে।
হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কহে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুলবনে।
হা দেবী, হা দেবী বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
নীরবে হরিণী বালা ভাসবে নয়নজলে। (বিহারীলাল)

রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গলে'র বিভিন্ন সর্গের বিভিন্ন পংক্তি সঞ্চয়ন করে যেন একটি মাল্য-রচনা করেছেন। কোন কোন পংক্তি হুবহু মিলে যায়। এতে তার নিজস্ব কবিকল্পনার বিকাশ বিশেষ হয় নি। যেমন

হৃদয় রাখ গো দেবী, চরণে তোমার,
এস মা করুণারাণী ও বিধুবদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সম্মুখে আমার,
মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলায়ে অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো স্নেহের প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনমালা অতুল রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার।
অদর্শন হলে তুমি ত্যজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল বিনে।
হা দেবী হা দেবী বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির আমার
হেরিব জগৎ শুধু আঁধার আঁধার। (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাবই গ্রহণ করে নি, বিহারীলালের ভাষা পর্যন্ত বিনা-দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন।

৫

'সারদামঙ্গলে' দেখতে পাই—

তোমারে হৃদয়ে রাখি সদানন্দ মনে থাকি
শ্মশান অমরাবতী দুই ভাল লাগে।
ভক্তিভাবে একতানে মজেছি তোমার ধ্যানে—
কমলার ধন মান নাহি অভিলাষী।

বিহারীলালের এই সারদাই যে কাব্যলক্ষ্মী যে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না। কবি একেই বন্দনা করে এই সব কথা বলেছেন।

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র অনুকরণে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' কবির নিজস্ব ভাবকল্পনার বিকাশ বিশেষ দেখা যায় না বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে এই সব কথাই কবি নিজস্ব ও আরও সুন্দর করে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যের "পুরস্কার" কবিতায় বাণীবন্দনা করেছেন—

প্রকাশো জননী নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
... ... ...
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন—
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন—
উদাসীন আনমনা।
চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
... ... ...
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী—
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসারকোলাহল।
সে জন পাগল-পরান বিকল—
ভবকূল হতে ছিড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল,
ঠেকেছে চরণে তব।

৬

বিহারীলালের এই সব গীতি-কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ভিতর বেশ একটা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। রোমান্টিক মনোভাবের একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকানো। বাঁধা পথে না গিয়ে নিজস্ব ভাবদৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকানোই রোমান্টিক মনের বৈশিষ্ট্য। রোমান্টিকের কাজ বাইরের জগৎ নিয়ে নয়—অন্তর-জগৎ নিয়ে। বাইরের জগৎ নিয়ে সে সুখী হতে পারে না, তাই

ফিরে আসে নিজের সৃজিত জগতে। সেখানে সে নিজের ভাবের ঐশ্বর্যে বাইরের জগৎকে সাজিয়ে নেয়। বহির্জগতের যা কিছু অপূর্ণতা সবই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে রঙীন করে তোলে। বাস্তবের অপূর্ণতাকে অন্তরের অজস্র ঐশ্বর্যসম্পদে ভরিয়ে তোলে। বহির্বিশ্ব থেকে অন্তর-রাজ্যে এবং অন্তর-রাজ্য থেকে ভাব এবং কল্পনা নিয়ে বহির্জগতে আবার ফিরে আসা—এই যে রূপ থেকে ভাবে, এবং ভাব থেকে রূপে যাওয়া-আসা, এই যে আবর্তন-বিবর্তন, এইটাই রোমান্টিক মনের ধর্ম। জীবনে এই রোমান্টিক মেজাজটি ( mood ) কোন না কোন সময়ে আসে, তখন জীবনকে আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখা যায় না, সে এক বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে খণ্ডকালের জন্যও নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিকতাকে বৃহৎ করে দেখে। তখন ক্ষুদ্রতা আর ক্ষুদ্রতা থাকে না, তখন অসুন্দর বলে মনকে আর কিছুই পীড়িত করে তোলে না। এক অদ্ভুত সৌন্দর্য-বোধের দ্বারা সবই সুন্দর লাগে। অপরিচয়ের রহস্য মনকে মুগ্ধ আবেশে বিহ্বল করে তোলে। রোমান্টিক মনের ধর্ম—

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়—
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।

মনের এ আবেশ-বিহ্বলতাকে বা বিস্ময়-বিমূঢ়তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, বা এ ভাবটি মনের কোন্ অবস্থা তাও কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা বোঝানো যায় না। মনের মধ্যে যে একটি ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় তা শুধু অনুভবের সামগ্রী হয়ে থাকে। একে ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে গেলে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই যায় হারিয়ে। যদি ভাষার দ্বারা বা অন্য-কিছুর দ্বারা তাকে স্পষ্ট করে বোঝানো যেত তবে তা আর রোমান্টিক থাকত না।

বিহারীলালের মধ্যে আমরা এই ধরনের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাই। বিহারীলাল বাইরের জগতের দিকে চোখ খুলে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু বহির্বস্তুর যথাস্থিত স্বরূপে তিনি কোনদিনই খুশী হতে পারেন নি। তিনি ছিলেন ভাবুক কবি, নিজের চারিপাশে একটা কল্পনার মায়াজাল সৃষ্টি করে রাখতেন। তাঁর কাব্যের প্রধান লক্ষণ এই ভাব-বিভোরতা। "এই আত্মভাব মূলতঃ বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্যবোধ।" এই রহস্যকেই মায়াশক্তির মত বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য বলে তিনি জেনেছিলেন। এই রহস্যময়ীকেই কবি সৌন্দর্যময়ী, কান্তিরূপিণী মায়া বলেছেন। এই মায়াশক্তির সৌন্দর্য তিনি দেখেছেন অন্তরে বাইরে বহু বিচিত্র রূপে, বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে। কবির সারদাই তাঁর সৌন্দর্য-রূপিণী, তাই তিনি বলেছেন—

তুমিই বিশ্বের আলো তুমি বিশ্বরূপিণী
প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ
মানবমনের তুমি উদার সুষমা।

এই কান্তিময়ী রহস্যময়ীকে কবি পরিষ্কার করে বুঝতে চান নি, ভয় হয়েছে পাছে তাঁর কল্পনার জাল ছিন্ন হয়ে যায়। এই ভাবটিই রোমান্টিক কবির লক্ষণ। কবি বলেছেন—

রহস্য ভেদিতে আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকি ভাল, বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না।
... ... ...
রহস্যই মনোলোভা বিশ্বের সৌন্দর্যশোভা,
সুখের পূর্ণিমা রাতি, চাঁদের মধুর ভাতি,
ফুলের প্রফুল্ল হাসি, ঊষা'র কিরণ
সকলি কে যেন এক সাধের স্বপন।
রহস্য রহস্যময় রহস্যে মগন রয়
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে সবে মায়া বলে ডাকে,
আদরের নাম তার বিশ্ববিমোহিনী। ("সাধের আসন")

কিন্তু এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যে অপরূপ রহস্য-বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। শুধু বিহারীলালের কেন, ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের 'রোমান্টিসিজম্'-এর সমস্ত রূপই তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। রোমান্টিক কবিদের এই সব বিচিত্র ভাবসম্পদকে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করে গেছেন—শুধু পরিমাণে নয়, গুণেও।

বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার যে একটা নিগূঢ় প্রীতির সম্বন্ধ আছে তা ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের কাছেই যদিও প্রথম ধরা পড়েছে, কিন্তু তবুও সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে অথবা প্রকাশভঙ্গীতে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার যে একটা অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন বিদ্যমান, এ জিনিস রবীন্দ্রনাথের মত নিবিড়ভাবে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য, সাহিত্য ও জীবনে এই সত্য যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এমন আর কারও ভিতর দেখা যায় না। কবি বলেছেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

এই সুপরিচিত ধরণীর গোপন আহ্বানের ইঙ্গিত কবি বার বার শুনতে পেয়েছেন। যে ভাষায় প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছে তার ভিতর যেন কোন্ বিস্মৃত লোকের আভাস নিহিত রয়েছে

যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চিরদিবসের ভুলে যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই নিগূঢ় পরিচয়, নিবিড় আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে এক বিশিষ্ট রূপ দান করেছে, যা এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি।

৭

কাব্যলক্ষ্মী সারদাকে যেমন কবি বিহারীলাল সকল সৌন্দর্যের, সকল রহস্যের মূলীভূত কারণস্বরূপ ধরে নিয়েছেন এবং আজীবন তাঁরই পদপ্রান্তে পড়ে থাকবার কামনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথও এই সৌন্দর্যরূপিণী কান্তিময়ীর কাছে একান্ত নিবেদন জানিয়ে বলেছেন—

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

সর্বচৈতন্যের উর্ধ্বে এক নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যচেতনাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সর্বোত্তম বিশিষ্টতা। আপনাকে সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন করে দেবার জন্য এমন তীব্র ব্যাকুলতা ও একনিষ্ঠ সাধনা অন্য কারও সাহিত্যেই দেখা যায় না।

বিহারীলালের কাব্যে "ভাব-ভরা মাতোয়ারা" কবি চোখ মেলে বিশ্বের যে দিকে চেয়েছেন সেখানেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব লক্ষ্য করেছেন। বাইরের জগৎ অন্তরে প্রবেশ করে এক বিচিত্র মায়াজাল সৃষ্টি করে আবার বাইরে প্রকাশিত হয়েছে স্বমহিমায়। তাই বিহারীলাল বলেছেন—

কে তুমি হুষমা মেয়ে আছ মুখপানে চেয়ে
আলো করে অন্তরাত্মা আলো করে ধরণী ?

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যেও আমরা দেখি, কবি এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে "দ্যুলোকে ভূলোকে" দেখেছেন, আবার তাকে নিবিড় ভাবে পাবার জন্য পুলক-রোমাঞ্চ কবিকে ভাববিহ্বল করে তুলেছে।—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী,
... ... ...
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী,

অন্য দিকে আবার—

অন্তর-মাঝে শুধু তুমি একা একাকী,
তুমি অনন্তব্যাপিনী।

এই অন্তরবাসিনী বিচিত্ররূপিণী নিত্যভাস্বর দীপ্যমানা সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবিকে আজন্ম সঙ্গদান করেছেন। তিনিই কবির জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি চিরদিন কবির কাছে রহস্যময়ী রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। এই রহস্যময়ী কবির জীবনে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থেকে কবিকে নিরন্তর সঙ্গদান করেছেন। জীবনের এই প্রথম প্রেয়সী "ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী''র সঙ্গে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে, বহু বাল্যকালে কবির আধ-চেনাশোনা হয়েছিল। সেই প্রেয়সী—

কী জানি সে কবে
...............খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছে অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত।
... ... ...
ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ("মানসসুন্দরী")

আরও পরে—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে, স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার। (ঐ)

বিহারীলালও তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারদার আবির্ভাব দেখেছেন কখনও

জননীরূপে, কখনও প্রেয়সীরূপে, কখন বা কন্যারূপে। কবি মাতৃসম্বোধন করে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে আহ্বান করেছেন—

এসো মা উষার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে
রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখ হৃদয়-কমলে।"

('সারদামঙ্গল', প্রথম সর্গ)

আবার এঁকেই "ললাটিকা মেয়ে" বলে সম্বোধন করেছেন, কখনও বা প্রিয়ারূপে সম্বোধন করেছেন—

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী
আলয়-কমলা করুণাবতী।
প্রিয়ে তুমি মোর অমূল্য রতন
যুগ-যুগান্তরে তপের ফল,
তব প্রেম-স্নেহ-অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

কতবার কতরূপে এই কাব্যলক্ষ্মী কবির কাছে এসেছেন, কিন্তু তবুও তিনি অপরিচিতা, এখনও কবির কাছে তিনি "রহস্যমধুরা"। রোমান্টিক কবিমনের এই দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্র-কাব্যে আরও বেশী রহস্যজালে আবৃত, নিবিড় রসঘন হয়ে উঠেছে। যিনি কবিকে সারা জীবন সঙ্গদান করে এসেছেন, তাঁকে কবি কখনও বোঝেন, কখনও বোঝেন না। হৃদয়ের মধ্যে নিবিড়ভাবে পেয়েও সংশয়ে মন দুলে উঠেছে বারে বারে। কবি বলেছেন—

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে,
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কতজন এসে মোরে ডেকে কয়,
"কে গো সে?" শুধায় তব পরিচয়—
"কে গো সে?"
তখন কি কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কি জানি কি জানি!"
তুমি শুনে হাস, তারা দূষে মোরে
কি দোষে?

কবির সঙ্গে তাঁর চিরন্তনী লীলা চলছে, তিনি কবির "অন্তরব্যাপিনী" তবুও বলছেন, ওগো রহস্যমধুরা কৌতুকময়ী, তুমি কে?

বিহারীলাল তাঁর রহস্যময়ীকে বেশীক্ষণ রহস্যের মধ্যে রাখতে পারেন নি, তাঁকে বারে বারে একটা অদ্বয় মূর্তিতে দেখতে চেয়েছেন। এই মিস্টিক অদ্বয় দর্শনের ফলে কবির দৃষ্টি মাঝে মাঝে একটা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এই-জন্যই বিহারীলাল তাঁর সারদাকে প্রায়ই "যোগেন্দ্রবালা", "যোগেশ্বরী", "যোগেন্দ্রের ধ্যানধন" প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিও মিস্টিক হয়ে উঠেছে যেখানে এই রহস্যময়ী ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে জীবনদেবতায় পরিবর্তিত হয়েছেন। যিনি এতদিন "রহস্যমধুরা" "কৌতুকময়ী" ছিলেন, তাঁকে কবি এখন বলেছেন—

হে চিরপুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নতুন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

রবীন্দ্র-কাব্যের এইখানেই বৈশিষ্ট্য যে, কবি জীবনদেবতার সাক্ষাৎ বহুবার পেয়েছেন, কিন্তু তাই বলে তাঁর "রহস্যসঙ্গী"কে কোনদিন বিদায় দিতে পারেন নি। জীবনদেবতার মধ্যেও তিনি তাঁর অন্তরের রহস্যময়ীকে সর্বদাই দেখেছেন, তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। তাই 'পূরবী'তে "শেষ রাগিণীর বীণ" যে দিন বেজে উঠল, সে দিনও কবি বলেছেন—

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে মনে হল যেন চিনি—
কবে নিরুপম ওগো প্রিয়তম, ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
("লীলাসঙ্গিনী," 'পূরবী'

৮

বিহারীলালের প্রেম-সাধনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা সম্পর্কের প্রীতিতে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। মানবপ্রীতি তাঁর প্রাণে মনুষ্যজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। এই বিস্ময়ের মধ্যেই তার মনে জাগত অপরূপ সৌন্দর্যবোধ। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের প্রতি মানুষের যে কামনালেশহীন ভালবাসার আবেগ আছে তার মধ্যেই জগৎরহস্য নিহিত আছে। "কোন সৌন্দর্যই সৌন্দর্য নয় যাহা এই প্রীতির রসে সিঞ্চিত নয়, কারণ মানুষ যদি ভাল না বাসে তবে সৌন্দর্য যেমন হোক, তাহাকে উপলব্ধি করিবে কোন্ বুদ্ধির দ্বারা? প্রাণ যদি না জাগে তবে চোখে সেই দৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে? এই প্রীতিমন্ত্রের সাধনায় বিহারীলাল যে সৌন্দর্যের আদর্শ

সন্ধান করিয়াছিলেন তাহাতে বাহিরের রূপ বা বিশ্বপ্রকৃতির শোভা ও অন্তরের অনুভূতি, বাস্তব ও কল্পনা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, সৌন্দর্যপিপাসা ও হৃদয়বৃত্তি একই রস-চেতনায় নির্বিরোধ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিযাছে।" বিহারীলালের প্রেম-সাধনায় কামনা আছে, প্রবৃত্তির জ্বালাময়তাও বেশ আছে, কিন্তু তা শান্ত প্রীতি ও সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা সংহত হয়ে উঠেছে। বিহারীলাল তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"ভালবাসা সৃষ্টি করিযা ঈশ্বর ভালই করিযাছেন···ভালবাসার চরম চরিতার্থতার স্থান এই বিশ্ব···নর-নারীতে ভালবাসা প্রথম প্রস্ফুটিত হয। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় করিযা রাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই অমায়িক আত্মভাব দেবদুর্লভ। ইহার নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে।"

বিহারীলাল বাস্তব স্নেহ-প্রেম প্রীতিতে তৃপ্ত হযেছিলেন সত্য, কিন্তু তাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেখে তৃপ্ত হতে পারেন নি। এই প্রেম-ভালবাসাকে সবত্র উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। যে প্রেম বাস্তব-প্রীতিব রসে সমুজ্জ্বল, তাকেই তিনি বিশ্বময অনন্ত সৌন্দযেব মধ্যে দেখতে চেযেছেন। এখানে বিহারীলালের ভাবধারাব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব ভাবধাবা একেবাবে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হয। রবীন্দ্রনাথও যতক্ষণ না তাঁব প্রেমকে বিশ্বময ব্যাপ্ত কবে দিতে পেবেছেন ততক্ষণ স্বস্তি পান নি।

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ কামনা বাসনা বা দৈহিক সংস্কারকে কোনদিন উপেক্ষা বা অস্বীকার করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে প্রেম ও কামের মধ্যে একই তত্ত্ব নিহিত রযেছে। কামই সৌন্দযেব আদি প্রেরণা, কারণ—

যে আনন্দ-কিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মে যত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে

এবং মূলে ছিল কামেবই প্রেরণা। বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যের ধ্যানে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষ্ণা মেটাতে চেযেছিলেন সে সৌন্দর্যপিপাসা ও প্রাণের পিপাসা একই। তবে এ পিপাসায় জ্বালা নেই, আছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্জন করে দেবার পরম পরিতৃপ্তি।

বিহারীলাল নিজের কল্পনায বস্তুজগৎকে idealise কবে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও তাকে অস্বীকাব করেন নি। তাঁর কাছে প্রেম যেমন জগতের অন্তর্নিহিত সত্য বলে প্রতীযমান হযেছে কায়াও তেমনি তাতে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। কায়াহীন সৌন্দর্য কবি ভাবতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নর-নারীর ব্যাকুল কামনা-বাসনা দেহের সীমায় এসে মিলিত হয়েছে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই কবি বলেছেন—

দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক জীবনে নরনারীর প্রেমকে অস্বীকার না করলেও, এই প্রেম কোথাও উদগ্র কামনা হয়ে দাঁড়ায় নি। এ প্রেম অন্ধকার রাত্রির মত যেন তপস্যায় স্তব্ধ। এইজন্যই ভাবধর্মী রোমান্টিক দৃষ্টি রবীন্দ্র-কাব্যকে একটি শুচিশুভ্র সংযম দান করেছে। এ প্রেম বন্দী করে নি, দিয়েছে মুক্তির আনন্দ, তাই—

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন। ('বলাকা')

৯

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যে, মানবপ্রেমের ভিতর দিয়েই ভগবানের প্রেম লাভ করা যায়। তাঁর মতে ভগবানের প্রেম মানবকে অস্বীকার করে পাওয়া যায় না। মানবের প্রেমের সেতু পার হয়ে তবে ভূমানন্দের সঙ্গে মিলন ঘটে। মানবের প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব মহিমময় দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়েছে—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।
("বৈষ্ণব কবিতা", 'সোনার তরী')

সহজ সুরে এত বড় গভীর কথা এক বৈষ্ণব পদকর্তাগণই গেয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মানব-প্রেমের মধ্যে মুক্তির এই সাধনাই করে গিয়েছেন সারা জীবন।

বিহারীলাল কিন্তু মানবপ্রেমের সঙ্গে ভগবানের প্রেমকে এমন নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর মনে ছিল সংশয়ের দোলা, তাই বলেছেন—

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?

বিচিত্র গগন ফুল কল্পনালতার ?
মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার ? ('সারদামঙ্গল')

নিজেই আবার বলেছেন—

এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী !
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপন বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী। (ঐ)

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার তুলনামূলক সমালোচনা করে এ কথা মনে করা উচিত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত ভাবধারা বিহারীলালের কাছ থেকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন শিশু তখন বিহারীলালের প্রভাব তাঁর উপরে যথেষ্ট পড়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ নিজের দেবদুর্লভ প্রতিভার দ্বারা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এ কথা বলা যায় যে, বিহারীলালের কবি-মনোধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মের খুব নিকট-সাদৃশ্য ছিল। তাঁদের উভয়ের আন্তরসত্তার প্রবণতা প্রায় একই দিকে ছিল। তাই দুজনের মধ্যে এমন নিগূঢ় সাধর্ম্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রথম উন্মেষে বিহারীলালের প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছিল সে কথা কবি নিজেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কবি এক জায়গায় বলেছেন—"'পল বার্জিনী'তে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।"

কবির শিশুকালের অবরুদ্ধ অজানা অব্যক্ত অনুভূতি বিহারীলালের কাব্যের মধ্য থেকেই প্রথম মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। তাই বিহারীলালকে গুরু বলে মেনে নিতে তাঁর কোথাও কুণ্ঠার অবকাশ ছিল না। কবি বলেছেন—

"যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম!"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকের মূলভাবটি,

এমন কি স্থানে স্থানে ভাষা পর্যন্ত, বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র আরম্ভভাগ থেকে গৃহীত।"

'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনুকরণের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র পর্ব থেকে তিনি সেই অনুকরণের বন্ধন ছেদন করে নিজের ইচ্ছার অনুরূপ ছন্দ ও স্বকীয়ভাব অবলম্বন করেন।

কবির প্রথম জীবনে বিহারীলালের কাব্যের ভাব ভাষা ছন্দ ইত্যাদির প্রভাব পড়লেও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের শতমুখী কাব্যপ্রতিভার কাছে বিহারীলাল দাঁড়াতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মত অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভার পক্ষেই বার বার নিজেকে এভাবে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব।